বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ও ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট।

বালক-পাঠ্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য]

স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজের অধ্যাপক

শ্রীমন্মথমোহন বসু এম. এ. সঙ্কলিত।

পঞ্চম সংশোধিত সংস্করণ।

কলিকাতা,

প্রকাশক—বি, ব্যানার্জি এণ্ড কোং,

২৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১৩২৮

মূল্য চৌদ্দ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বালক-পাঠ্য

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ মানের জন্য।

উপক্রমণিকা।

প্রিয় বালকগণ! এই পুস্তকে তোমরা ভারতের আধুনিক ইতিহাস ও ইংরাজ রাজত্বের বিবরণ পাঠ করিবে। তোমরা জান যে, ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশ মুসলমানদিগের ও তৎপূর্ব্বে হিন্দুদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। আবার হিন্দুদিগের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে নানাপ্রকার অসভ্য জাতির বাস ছিল। হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন ও বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের পর এদেশ জয় করিয়া অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করেন।

বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের অধিকারে থাকে ও তাঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও বুদ্ধির গুণে এদেশে সভ্যতা স্থাপিত হয়,—এদেশের ধন বৃদ্ধি হয়,—শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। কালক্রমে হিন্দুদিগের শক্তি খর্ব্ব হইলে বিদেশীয় পরাক্রান্ত অসভ্যজাতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে থাকে ও উহাদের অনেকেই হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া ভারতের

নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু ক্রমে উহারা হিন্দুদিগের রীতি-নীতি আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দু-সমাজে মিশিয়া যায় ও হিন্দু-ধর্মের পুনরায় অভ্যুদয় হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে হিন্দুগণ আত্ম-কলহে ব্যাপৃত হন ও আবার দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। সেই সুযোগে মুসল-মানধর্ম্মাবলম্বী পাঠান জাতি ভারত জয় করেন। কিন্তু পাঠানগণ কোন সময়েই সমগ্র ভারতের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই; তাঁহাদের সাম্রাজ্যের পূর্ণোন্নতির সময়েও ভারতের কোন কোন অংশে হিন্দুগণ আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে পাঠানগণও হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয়। মুসল-মানদিগের প্রাধান্য থাকিতে থাকিতেই ইউরোপীয়গণ এদেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। ইংরাজ এদেশীয় নরপতিগণের মধ্যে অনৈক্য ও তাহার ফলে তাঁহাদের শক্তিহীনতা দেখিয়া ক্রমে এদেশে নিজের নিজের সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে এখানকার ইউরোপীয় জাতি-গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে অন্যান্য জাতিগণকে পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এই ইংরাজ সাম্রাজ্য একদিনে স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে কুঠী ও বাণিজ্য রক্ষার্থ তাঁহারা এদেশে দুই একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু তাহাতেও অত্যাচারী দেশীয় নরপতিগণের হস্ত হইতে নিস্তার না পাওয়ায় তাঁহা-দিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যুদ্ধের ফলে বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐস্থান হইতে তাঁহাদের অধিকার ক্রমে সমগ্র ভারতে ব্যাপিয়া পড়ে। অত্যাচার ও অপরিণামদর্শিতার ফলে দেশীয় রাজগণ নিজ নিজ অধিকার হারাইলেন বা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ক্রমে ইংরাজজাতি সুশাসনের প্রভাবে ও নৈতিক উৎকর্ষের গুণে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন।

আজ তোমরা দেখিতেছ যে ইংরাজেরা ভারতের রাজা। ইহার পূর্ব্বে

যে হিন্দু-অধিকার ও মুসলমান-অধিকার ছিল তাহাও তোমরা জান। তোমরা যেটুকু শিখিয়াছ তাহা হইতেই চিন্তার ফলে বুঝিতে পারিবে যে ইংরাজদিগের পূর্ব্বে ভারতে কখনও এরূপ স্থায়িভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্ব্বেও এদেশে সভ্যতা, বাণিজ্য, শিল্প. কৃষিকার্য্য প্রভৃতি সমস্তই ছিল। কিন্তু শান্তির অভাবে, সুশাসনের অভাবে, প্রজাবর্গের অদৃষ্টে সকল সময় নিরুদ্বেগে সুখ ভোগ ঘটিয়া উঠিত না।

এই ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও বর্ত্তমান ইংরাজ শাসনের প্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে ভারত-বর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা আবশ্যক। কারণ কোন দেশের কোন কালের ইতিহাস পাঠ করিবার সময় উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের বৃত্তান্ত জানা না থাকিলে, সে ইতিহাস ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না এবং নূতনের সহিত পুরাতনের তুলনা করিয়া পরস্পরের শাসনপ্রণালীর দোষগুণ বিচার করা কঠিন হইয়া উঠে।

অতএব তোমাদিগকে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস বলিবার পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান অধিকার কালে ভারতের অবস্থা, শাসনের প্রকৃতি ও দোষগুণ এবং হিন্দু ও মুসলমানের অধঃপতনের কারণ প্রভৃতি বিষয়গুলির কথা সংক্ষেপে বলিব।

প্রথম অধ্যায়।

—:o:—

হিন্দু শাসনকাল।

হিন্দুজাতির উন্নতি ও অবনতি।

আর্য্যদিগের ভারতে আগমন ও অধিকার বিস্তার।— তোমরা জান যে ভারতবর্ষ একটী প্রকাণ্ড দেশ। এদেশে প্রায় ৩২ কোটি লোকের বাস, এবং এই অধিবাসিগণের মধ্যে সকলেই এক জাতীয় বা এক ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোক নানা সময়ে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ফলে সভ্যতম হইতে অসভ্যতম পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতে অতিশয় অসভ্য একজাতীয় লোকের বাস ছিল। তৎপরে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দ্রাবিড় জাতীয় লোকগণ ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে এক প্রকার মোঙ্গল জাতীয় লোক এদেশে আগমন করে। ইহাদিগের পরে আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন ও ক্রমে এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আবার আর্য্যদিগের এদেশে বসবাস স্থাপনের পর শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা জাতীয় বিজেতৃগণ এদেশে আগমন করেন। তদ্ভিন্ন উৎপীড়ন হেতু স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া কতকগুলি য়িহুদী ও সীরিয়াবাসী খ্রীষ্টান দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখনও উঁহাদের সন্তান সন্ততি দক্ষিণ ভারতে বাস করিতেছেন। অন্যান্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রথমতঃ আর্য্যজাতির কথা বলিব।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে আর্য্যগণ মধ্যএসিয়ার মালভূমি হইতে এদেশে আসেন। কতদিন পূর্ব্বে তাঁহারা ভারতে প্রবেশ করেন তাহার কিছু ঠিক নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁহারা প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ ও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহাদিগের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পাই নাই। তবে ঋক্, যজুঃ প্রভৃতি চারিখানি বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা আর্য্যদিগের এদেশে রাজ্যস্থাপন, যুদ্ধ ও সামাজিক রীতিনীতি পদ্ধতির বিষয় কিছু কিছু জানিতে পারি। ঋগ্বেদের নানাস্থান হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আর্য্যগণ প্রথমে কাবুল নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ ভূমিতে ও

অনার্য্য জাতি।

পঞ্জাব প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ক্রমে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাবৎ গাঙ্গেয় জনপদে অধিকার বিস্তার করেন। অনার্য্যদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিতে থাকে। অনার্য্যদিগেরও রাজ্য ছিল, রাজা

ছিল, দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, কিন্তু আর্য্যদিগের পরাক্রমে তাহারা পরাভূত হয় ও তাহাদের কতকাংশ অরণ্যে ও পর্ব্বতে গিয়া বাস করে এবং অবশিষ্টাংশ আর্য্যদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া দাসরূপে সমাজে গৃহীত হয়।

অতি প্রাচীন অসভ্যজাতির প্রস্তর নির্ম্মিত তীরের ফলক।

আর্য্যগণের ধর্ম্ম ও সমাজ।—প্রাচীন আর্য্যগণ সরল-প্রকৃতি, সত্যবাদী ও নিজধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন। তাঁহারা অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার পূজা করিতেন ও তাঁহাদিগের নিকট ধনসম্পত্তি, দীর্ঘায়ু ও জয়াদি লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে দেবতাগণ পাপীর দণ্ডবিধান করেন ও পুণ্যবানকে পুরস্কার দেন। কিন্তু দেবতাগণ যে পরস্পর পৃথক নহেন, পরন্তু একই ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র, বেদে এ ভাবের ইঙ্গিতও দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের সমাজও বিশেষ উন্নত ছিল। তাঁহারা পিতামাতাকে ভক্তি করিতেন, দরিদ্রকে দয়া করিতেন, অতিথির সেবা করি-

তেন, দস্যু তস্করকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেন। স্ত্রীলোকগণের সম্মান ছিল, তাঁহারাও শিক্ষিতা হইতেন ও প্রাপ্তবয়স্কা হইলে ইচ্ছানুযায়ী যোগ্যপাত্রে সমর্পিতা হইতেন। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিতেন, এবং স্ত্রীপুত্রাদির সহিত যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন।

এইরূপে দেবতায় ভক্তি ও নৈতিক বলবীর্য্যাদির গুণে আর্য্যেরা জয়ী হইতে লাগিলেন। অনার্য্যদিগকে তাঁহারা বরাবরই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আবার অনার্য্যেরাও সর্ব্বদাই শত্রুভাবে আর্য্যগণের অনিষ্টাচরণ করিত। বিশেষতঃ আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে এত পার্থক্য ছিল যে পরস্পারের এই বিদ্বেষ ভাব সহজে অপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।—ফলতঃ আর্য্য অধিকার বিস্তৃতির সহিত এই বৈরভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থায় দাঁড়াইল যে, আর্য্যগণ আত্মরক্ষার্থে তাঁহাদের সমাজ নূতন ভাবে গঠন করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে সমাজ এরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে যাহাতে নিজেদের জাতীয়তা রক্ষিত হয়, আর্য্যজাতি অনার্য্যদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া না পড়ে এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের উৎকর্ষ ও উন্নতি বজায় থাকে। সকলে যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি রহিত হইয়া যাইবে, আবার যুদ্ধবিগ্রহ না করিতে পারিলে অনার্য্যজাতির নিকট পরাজিত হইয়া আর্য্য-জাতির জাতীয়তা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন রাজ্য ও লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত কৃষিবাণিজ্যাদির প্রসারেরও বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এই সমস্ত কারণে ক্রমে আর্য্যসমাজ নূতনরূপে গঠিত হইল এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে প্রভেদ ছিল, কিন্তু আর্য্যদের স্বীয় সমাজের ভিতর কর্ম্ম বা জাতিগত পার্থক্য বিদ্যমান ছিল না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁহাদের সমাজে এই বিভিন্নতা প্রবেশ লাভ করি-

য়াছিল। আর্য্যসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বর্ণের কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রচর্চ্চা ও বিজ্ঞান দর্শনাদির আলোচনা করিতেন, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মে পৌরোহিত্য করিতেন এবং ক্ষত্রিয়াদির নিকট প্রতিগ্রহ করিয়া কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা সমাজের বাহুবল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দৈহিক বলের উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হইয়া অস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া সমাজকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন এবং সুবিধা পাইলে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনও করিতেন। বৈশ্যরা কৃষিকর্ম্ম, গোপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমাজের লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীকরণে যত্নবান থাকিতেন। আর শূদ্রেরা উপরি উক্ত তিনবর্ণের অধীন হইয়া তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণের লোক উপবীত ধারণ করিয়া 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হইতেন এবং সমাজের উৎকর্ষ রক্ষার জন্য নিজ নিজ বৃত্তি অনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই সংযত ভাবে জীবন যাপন করিতেন। প্রত্যেকের জীবন চারিটী আশ্রমে বিভক্ত ছিল। জীবনের প্রথম অংশ বা আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্য; এই সময় দ্বিজাতীয় কুমারগণ উপবীত ধারণান্তে গুরু গৃহে বাস করিয়া, ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে গুরুর উপদেশ লাভ করিতেন। দ্বিতীয় আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য; শিক্ষা শেষ হইলে দ্বিজগণ গুরুর অনুমতি ক্রমে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ বিবাহ করিয়া সমাজের উন্নতি কল্পে গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করিতেন এবং দেবপূজা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দরিদ্রের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও পুত্র কন্যাদির ভরণপোষণ করিতেন। তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ; গার্হস্থ্য জীবনান্তে পরিণত বয়সে ধর্ম্মনিষ্ঠ দ্বিজমাত্রেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেন এবং আত্মার উন্নতিকল্পে ঈশ্বরারাধানায় নিযুক্ত হইতেন।

চতুর্থ আশ্রমের নাম সন্ন্যাস বা ভৈক্ষ্য; এই আশ্রমে দ্বিজগণ ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একাগ্রচিত্তে মোক্ষচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ফলে আর্য্য সমাজের অশেষ উন্নতি হইল। সমাজ, ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক শত্রু হস্ত হইতে ও বৈশ্য কর্ত্তৃক গ্রাসাচ্ছাদনের ক্লেশ হইতে রক্ষিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। আর সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ, ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দর্শন, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদির চর্চ্চা করতঃ ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানের উন্নতির জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ফলে অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় সভ্যতা সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ লাভ করিল এবং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জগতের চতুর্দ্দিক ভারতীয় জ্ঞান ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইল।

ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা।—অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যগণ পরলোক সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমি কে, জগৎ কি, মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, ইত্যাদি জটিল প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মার মৃত্যু নাই; জীব নিজ কর্ম্মফলে ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। কি করিলে এই সকল দুঃখ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি পাওয়া যায়, এই চিন্তায় তাঁহারা ব্যাকুল হইলেন। ফলে উপনিষদাদি গ্রন্থ রচিত হইল এবং ক্রমে নানা ধর্ম্মমত ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম।—এই সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতৃগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, আবার কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিলেন না এবং বেদ উপনিষদাদির মত অগ্রাহ্য করিলেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়গণের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈদিক যাগযজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হইত, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বলিয়া

মত প্রচার করিলেন এবং যে সকল যাগযজ্ঞে জীবহিংসা হইত সেগুলি উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা জাতিভেদ মানেন না, তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল সকলেই সমান—সকলেই পাপ-পুণ্যের ভাগী, এবং জ্ঞানলাভ ভিন্ন কাহারও মুক্তির উপায় নাই।

বুদ্ধদেব।

ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল। দলে দলে জাতি নির্ব্বিশেষে লোকে বুদ্ধদেবের মত অনুসরণ করিতে লাগিল ও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পর শূদ্র রাজা অশোকের সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্ম ভারতে বিশেষ প্রবল হইল এবং এই বৌদ্ধ প্রাধান্যের যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম কিছুদিনের জন্য ম্লান হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি।—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য ভারতে চিরস্থায়ী হইল না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন

বুদ্ধগয়ার মন্দির।

এবং আত্মকলহে রত হইলেন। বুদ্ধদেব নৈতিক উৎকর্ষের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, কায়মনোবাক্যে সদাচারী হওয়াই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। কিন্তু সাধারণ বৌদ্ধগণ তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত ভুলিয়া গিয়া স্তূপ নির্ম্মাণাদি, নখদন্তের পূজা প্রভৃতি

সারনাথ স্তূপ।

গুলিকে প্রকৃত মোক্ষের মার্গ বলিয়া মনে করিল। ফলে তিন চারি শত বৎসর যাইতে না যাইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য খর্ব্ব হইয়া আসিল। এই সুযোগে আবার ব্রাহ্মণগণ দয়া, ভক্তি বিশ্বাস প্রভৃতির উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়া নূতন আকারে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিলেন। প্রাচীন হিন্দুমত সমূহ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া সেগুলি উপাখ্যানাকারে সাধারণ লোককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল, এবং তদুদ্দেশ্যে "পুরাণ" নামে অভিহিত

ধর্ম্মগ্রন্থ সকল রচিত হইল, প্রাচীন দুরূহ যাগযজ্ঞের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গেল, অনেক বৈদিক দেবতা পরিত্যক্ত হইলেন, এবং অনেক নূতন দেব দেবীর পূজায় জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হইল। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাষা, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রের পুনরালোচনা হইতে লাগিল। ফলে পুনরায় ভারতে হিন্দুরাজশক্তির প্রাবল্য হইল এবং গুপ্ত রাজগণ ভারতে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃস্থাপন করিলেন।

হিন্দু সমাজে বিপ্লব ও হিন্দুজাতির পুনঃপতন।—কিন্তু গুপ্ত বংশের রাজত্বের শেষভাগে আবার নানাপ্রকার বিপ্লবে সমাজ হীনবল হইয়া পড়িল, এবং বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণে গুপ্ত সম্রাট্‌গণ হীনশক্তি হইয়া পড়িলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মেও ঐরূপ নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইল।

এই সমস্ত বিপ্লবের কিছুদিন পরে আরবে মুসলমান শক্তির উৎপত্তি হইল, এবং সে শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ভারত সন্নিধানে উপনীত হইল। মুসলমানগণের সহিত হিন্দুগণ বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক ও সামাজিক একতার অভাবে এবং পরস্পর হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে তাঁহারা আর মুসলমানদিগের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। সবক্তেগীন ও মাহমুদের সময় মুসলমানেরা ক্রমে পঞ্জাব পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন ও ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। ইহাতেও হিন্দুদিগের চৈতন্য হইল না। তাঁহারা তখনও সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া লইতে পারিলেন না ও আত্মকলহ হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। ফলে মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে বলদৃপ্ত মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলেন। কিন্তু শত্রুর আক্রমণেও দিল্লীর সম্রাটের সকল সামন্ত এক হইয়া বিদেশীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিলেন না। সুতরাং প্রথমে অকৃতকার্য্য হইয়াও মহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয়বারে অনায়াসে উত্তর-

ভারত বিজয় করিয়া লইলেন। উত্তর-ভারত বিজয়ের পর ক্রমে পূর্ব্ব-ভারত ও পরে দক্ষিণ-ভারত মুসলমানদিগের করতলগত হইল।

প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক একতা ও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা।—ধর্ম্ম প্রভৃতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল রাজার মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী হইতেন, অবশিষ্ট রাজগণ তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন এবং ঐ পরাক্রান্ত রাজা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিজের ক্ষমতা দেখাইতেন ও অন্য রাজগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির সময়ের পরে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মের সময় উত্তর-ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে কোশল রাজ্য প্রধান ছিল। ক্রমে মগধরাজ্য প্রবল হইয়া উঠে ও কোশল প্রভৃতি জয় করিয়া উত্তর-ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করে। ইহার কিছুকাল পরে আলেক্‌জাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পর কূট রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধের সিংহাসনে চন্দ্রগুপ্তকে অভিষিক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় মগধের সাম্রাজ্য প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ব্যাপী ছিল। তাহার পর অশোক মগধ সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। অশোকের মৃত্যুর পর কিছুকাল পরে মৌর্য্যদিগের পতন হইলে ঐ বিস্তৃত সাম্রাজ্য আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। ইহার পর ভারতের অনেকাংশে অন্ধ্রগণ আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য অত বিস্তৃত হয় নাই।

ক্রমে শকাদির আক্রমণে অন্ধ্রারাজ্য বিনষ্ট হইলে ভারতবর্ষ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে ও উহার নানাস্থানে নানা জাতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় রাজা রাজত্ব করেন। অতঃপর চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজ সমুদ্রগুপ্ত প্রায় সমস্ত ভারত জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ও

পৌত্রের সময় সাম্রাজ্যের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। গুপ্তদিগের সাম্রাজ্য হূণ হস্তে বিনষ্ট হইলে কিছু দিন যশোধর্ম্মদেব, ও যশোধর্ম্মদেবের পর হর্ষবর্দ্ধন উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করিয়া প্রবল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। হর্ষের মৃত্যুর পর পালবংশীয় কোন কোন সম্রাট্ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজা তাঁহার ন্যায় এত বড় রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই।

ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিলে যে যদিও প্রাচীন ভারতে অনেক হিন্দু রাজা বড় বড় সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, তাঁহাদের কাহারও সাম্রাজ্য দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। একে ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ। বস্তুতঃ ইহাকে একটা দেশ না বলিয়া অনেকগুলি দেশের সমষ্টি এক মহাদেশ বলাই অধিকতর সঙ্গত, কারণ ইহার এক একটা প্রদেশকে এক একটা বড় দেশ বলিলেও চলে। ঐ সকল প্রদেশগুলিতে আবার প্রাকৃতিক ও অন্যান্য কারণ বশতঃ সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য বরাবরই ছিল। এই সমস্ত কারণে এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের লোককে অনেকটা বিদেশীয়ের মত দেখিত। সুতরাং সকলে আপন আপন প্রদেশের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকিত, সমগ্র দেশের ভাবনা কেহ ভাবিত না। ফলে কোন রাজা প্রবল না হইলে এক প্রদেশ অন্য প্রদেশের অধীনতা স্বীকার করিত না এবং সময়ে সময়ে কোন প্রদেশ কোন প্রবল রাজার অধীনত্ব স্বীকার করিলেও, তাঁহার বা তদ্বংশীয় রাজগণের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়িলে তাহা আবার কোন না কোন নেতার নেতৃত্বে স্বাধীন হইয়া পড়িত।

ভারতে হিন্দু-অধিকার বিনাশের কারণ।—উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিলে যে নানাকারণে ভারতে রাজনৈতিক একতার বিশেষ অভাব ছিল। এতদ্ভিন্ন পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবিপ্লব, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের দারুণ ঘৃণা প্রভৃতি কারণে সামাজিক একতারও [illegible] পরিমাণে

শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার উপর হিন্দুশাসন-কালের শেষভাগে সমাজের নৈতিক অধঃপতনেরও অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। বিলাসিতা, পরস্বলালসা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি পাপ প্রবেশ করিয়া অনেক শক্তিশালী রাজসংসার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সমস্ত কারণে ভারতে হিন্দু রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিদেশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুগণ এক হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে নাই। যদিও দুই এক সময় তাহারা একতা অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ঐ একতার কোন স্থায়ী ফল ফলিতে দেয় নাই। হিন্দু ইতিহাসে এইরূপ একতার অভাব বা স্বদেশ-প্রিয়তার অভাব বিরল নহে। আলেক্‌জাণ্ডার ভারতাক্রমণ কালে কোন কোন হিন্দুরাজার সহায়তা পাইয়াছিলেন। যখন মাহ্‌মুদ ভারতাক্রমণ করেন, তখন তাহার দলে অনেক হিন্দু সৈন্য ছিল। আবার মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময় জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিয়া ভারতে লইয়া আসেন। পৃথ্বীরাজ যখন প্রথমবার মহম্মদকে পরাজিত করেন, তখন তাঁহার ১০৮ জন সামন্তের মধ্যে মাত্র ৬৪ জন তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট রাজগণ স্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা উচিত মনে করেন নাই। এই সমস্ত কারণেই ভারতে হিন্দু রাজশক্তির পতন হইয়াছিল। বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল, কিছুরই তাঁহাদের অভাব ছিল না। স্বদেশ প্রিয়তার অভাব ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা বশতঃই কখনও তাঁহারা বিদেশীয় শত্রুর সহিত একপ্রাণ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে শত্রুর সাহায্য করিয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ফলে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল মুসলমানদিগের অধীন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

-:o:-

হিন্দুশাসনকালে দেশের অবস্থা ও শাসন-প্রণালী।

সামাজিক অবস্থা।—বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্য্যসমাজ কেমন করিয়া চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পরবর্ত্তী কালে যে সময় মনুসংহিতা রচিত হয় সে সময় জাতিভেদ প্রথা আর্য্যসমাজে বদ্ধমূল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি তৎকালে অসবর্ণবিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণে নীচবর্ণে বিবাহ হইত ও তাহার ফলে নানা সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অনেক দেশীয় অনার্য্যজাতি সভ্য হইয়া হিন্দুসমাজে স্থান পাইয়াছিল। এমন কি অনেক বিদেশীয় জাতিও ক্রমশঃ হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

নীচবর্ণজাতা কন্যা বিবাহ করিলে উচ্চবর্ণজাত বিবাহকর্ত্তার জাতি নষ্ট হইত না। কিন্তু নীচবর্ণজাত বর উচ্চবর্ণজাতা কন্যাকে বিবাহ করিলে, তাহাদের সন্তানসন্ততি জাতিভ্রষ্ট ও ঘৃণিত হইত। এই দুই প্রকার বিবাহ যথাক্রমে অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ নামে অভিহিত হইত। মনুসংহিতায় অষ্টপ্রকার বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ক্রমে এই সকল বিবাহপ্রথার নানা পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমান প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। রাজারা প্রায়ই বহুবিবাহ করিতেন এবং বিবাহকালে তাঁহারা সকল সময় জাতিবিচার করিতেন না। তোমরা জান, মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাজ সেলিউকসের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ রাজ-কন্যারাই স্বয়ংবরা হইতেন। রাজ-কুমারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের বিবাহের জন্য নানাদেশীয় রাজগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। পাণিগ্রহণেচ্ছু রাজ-

গণ উপবিষ্ট হইলে রাজকুমারী সভায় উপস্থিত হইয়া সহচরীর মুখে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন।

ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণ চিরকালই সরল, শান্তিপ্রিয়, উদার প্রকৃতি, ধর্ম্মবিদ্বেষশূন্য ও অল্পে সন্তুষ্ট। তাহারা ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী এবং ইহকালের সুখ অপেক্ষা পরকালের সুখের দিকেই অধিকতর মনোযোগী। প্রাচীন কালে এইভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত। রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, সে সময়ে আর্য্যসমাজে রাজভক্তি, পতিভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ ও গুরুভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণ পূর্ণমাত্রায় প্রবল ছিল। সকলেই স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সমাজে বিলাসিতা ছিল না, সুতরাং সাধারণে অভাব অনুভব করিত না। খ্রীষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মগধের রাজসভায় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তাহার পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান ও সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান্‌চোয়াং চীনদেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই ভারতবাসিগণের সরলতা, সাধুতা ও শান্তিপ্রিয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণজাতির ক্ষমতা।—হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতির সম্মান অন্যান্য সমুদয় জাতির অপেক্ষা অধিক। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ, এবং অন্যান্য সকল জাতির গুরু, পুরোহিত, ধর্ম্মোপদেশক। প্রাচীনকালে রাজা ব্রাহ্মণ বিচারকের পরামর্শ না লইয়া স্বাধীনভাবে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। দেশের আইনপ্রণয়ন একমাত্র ব্রাহ্মণের কার্য্য ছিল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে অধিনায়ক ছিলেন বটে, কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। ব্রাহ্মণজাতির এরূপ সামাজিক ক্ষমতার কারণ কি অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ সমুদয় বিষয়েই স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া এইরূপ সামাজিক সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সমগ্র জীবন

বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কার্য্যে নিরত থাকিতেন। শুধু বেদাদি নহে, তাঁহারা চিকিৎসা, দর্শন, ভাষা, ব্যাকরণ, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই চর্চ্চা করিতেন। অতুল জ্ঞানবলে বলী হইয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাচীনকালে হিন্দু-সমাজের এত উন্নতি হইয়াছিল এবং সেই জন্যই ব্রাহ্মণ তৎকালে সমাজের সকলের ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন।

শাসনপ্রণালী ও রাজনৈতিক অবস্থা।—শাসনপ্রণালী রাজতন্ত্র ছিল, কিন্তু রাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন না। হিন্দু ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মতে রাজা ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণের অবতার বিশেষ, অধর্ম্ম ও পাপ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাজার সৃষ্টি হয়, সুতরাং তিনি দেবতার ন্যায় পূজ্য। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম্মের রক্ষা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। রাজা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ও মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজ্য পালন করিতেন। রাজারা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতেন। প্রজারা ভূমির উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ করস্বরূপে রাজকোষে প্রদান করিত। রাজা প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন বলিয়া, প্রজা-পালন ও প্রজারঞ্জন রাজধর্ম্মের সারাংশ বলিয়া গণ্য হইত। রাজা প্রজা-পীড়ন করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেন।

শান্তিরক্ষার জন্য বর্ত্তমান থানার ন্যায় স্থানে স্থানে একটী করিয়া 'গুল্ম' থাকিত। রাজা প্রতিগ্রামে কর আদায় ও শান্তিরক্ষার জন্য একজন করিয়া মণ্ডল বা গ্রামাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাদের কার্য্যের পরিদর্শনের জন্য দশ গ্রামপতি, শত গ্রামপতি, সহস্র গ্রামপতি প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী থাকিতেন। রাজা পথ নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা প্রজা-দিগের সুখবৃদ্ধি করিতেন এবং দুর্ভিক্ষের সময় অল্পসুদে ঋণদান করিতেন।

রাজগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করিতেন। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যের অধিকারী হইতেন। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে বোধ হয় কখনও একচ্ছত্র হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এক এক জন নরপতি বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল রাজগণকে স্ববশে আনিয়া 'চক্রবর্ত্তী' বা 'মণ্ডলেশ্বর' হইতেন। যুদ্ধের সময় এই সকল সামন্ত রাজা নিজ নিজ সৈন্য সমভি-ব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া চক্রবর্ত্তী রাজার অধীনে যুদ্ধ করিতেন। বিশাল সাম্রাজ্য গুলি দেশ, বিষয় প্রভৃতি অংশে বিভক্ত হইত এবং ঐগুলি রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত।

পল্লীসমাজ।—হিন্দু রাজাদিগের শাসনকালে পল্লীসমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে প্রত্যেক গ্রামের গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের সাহায্যে গ্রামের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে ভূমির পরিমাণনির্ণয় ও সীমানির্দ্ধারণ করিতেন, পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিতেন, এবং করসংগ্রহ করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। গ্রামাধ্যক্ষ বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমিভোগ করিতেন। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য জলসেচনের ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যও তৎকালে গ্রাম্য সমিতির দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত।

যুদ্ধের নিয়ম।—তখন যুদ্ধের নিয়ম অতি পবিত্র ছিল। রুগ্ন, অস্ত্রহীন ও পলায়মান শত্রুর প্রাণবধ এবং বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যেরা কৃষকদিগের শস্যাদি নষ্ট করিতে পারিত না। স্ত্রী, বালক ও বন্দী অবধ্য ছিল।

শিক্ষা।—প্রাচীন ভারতে শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ বিদ্যাশিক্ষা ও বিদ্যাদান পরম ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। পুরুষ ভিন্ন অনেক স্ত্রীলোকও শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যলাভ করিতেন। শিষ্যেরা সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর অন্নে পালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। বৌদ্ধ বিহার গুলিতে নানা প্রকার শাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শনাদি

শিক্ষা দেওয়া হইত। ইউয়ানচোয়াংএর সময় বিহার প্রদেশে নালন্দা নামক স্থানে একটী প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইহাতে প্রায় দশ হাজার ছাত্র ভারতের নানা স্থান ও চীন প্রভৃতি দূরদেশ হইতে আসিয়া শিক্ষা করিত। দেশের ধনিগণ ও নরপতিবর্গ অধ্যাপকদিগকে সাহায্য করিয়া ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিতেন।

আর্থিক অবস্থা।—প্রাচীন হিন্দুগণের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস বলেন যে তাঁহার সময়ে ভারতে প্রচুর শস্য জন্মিত,

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা।

বিক্রমাদিত্য বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা।

দুর্ভিক্ষ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। সাধারণতঃ প্রজারা ধন-সম্পন্ন ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাহারা স্বর্ণ রৌপ্যাদির অলঙ্কার ব্যবহার করিত। নানাপ্রকার সোণা ও রূপার টাকা প্রচলিত ছিল। এই সকল টাকা দেশের নানাস্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এদেশের ধনের কথা শুনিয়া বিদেশীয় শত্রুরা পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিতেন। গজনীর স্থলতান মাহমুদ বার বার আসিয়া এত টাকা লুট করিয়াছিলেন যে, একবার তিনি রূপা ফেলিয়া দিয়া কেবল সোণা ও জহরৎ লইয়া দেশে যান।

বৈদেশিকগণের বর্ণিত ভারত বৃত্তান্ত।—হিন্দু শাসনকালে অনেক বৈদেশিক পর্য্যাটক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণ হইতে আমরা ভারতের তদানীন্তন অবস্থার অনেক কথা জানিতে পারি। শিক্ষিত বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক এ দেশের লোকের চরিত্র সমালোচনা আমাদের নিকট বিশেষ আদরণীয়, কারণ তাহার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস এবং চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ও ইউয়ানচোয়াংএর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে বলিব।

(ক) মেগাস্থিনিস।—গ্রীকরাজ সেলিউকস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মেগাস্থিনিস প্রায় সাত বৎসর কাল মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতবাসীরা শৌর্য্য-বীর্য্য সম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। ভারত রমণী সতীত্বের আদর্শ ছিলেন। ভারতবাসীরা এসিয়ার অপরাপর জাতি অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রবঞ্চনা, পরধনাপহরণ, মিথ্যাসাক্ষ্য, কলহ, বিবাদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমাজে অতিশয় বিরল ছিল। সাধারণতঃ লোকেরা মিতাচারী ছিল, কৃষকেরা শান্তস্বভাব ও পরিশ্রমী ছিল। তখন ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রামগুলিতে পঞ্চায়তের দ্বারা সমুদয় কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইত। ব্রাহ্মণেরা দুর্ভিক্ষাদির প্রতীকারের

চিন্তা করিতেন। তাঁহার সময়ে আফ্‌গানিস্তান হইতে বিহারের পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত মগধের শাসনাধীন ছিল।

(খ) চীন পরিব্রাজকগণ।—ভারতবর্ষ বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। এখানে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল। চীনদেশে অতি প্রাচীন কালেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক চীনদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজক সময় সময় তীর্থদর্শনার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। এই পরিব্রাজকদিগের মধ্যে ফা-হিয়ান ও ইউয়ানচোয়াং এই দুইজনের নামই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাঁরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ান যে সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সময়ে গুপ্তবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন। ফা-হিয়ান চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন প্রণালী ও তদানীন্তন ভারতবর্ষীয় সমাজের আচার ব্যবহারাদির অতি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। ফা হিয়ান বলেন, গঙ্গার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের নগরসমূহ ভারতবর্ষের অন্যান্য নগর অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। এই সকল নগরের অধিবাসীরা সম্পত্তিশালী ছিল, এবং সুখে ও সচ্ছন্দে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিত। সাধারণতঃ তাহারা ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ছিল। পথিকদিগের সুবিধার্থ সর্ব্বত্রই সুন্দর পান্থনিবাস ছিল, এবং রাজধানী পাটলিপুত্রনগরে একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় ছিল। এই চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা বিনাব্যয়ে ঔষধাদি প্রাপ্ত হইত। তৎকালে পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এরূপ চিকিৎসালয় ছিল না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারঞ্জক ছিলেন। ফা-হিয়ানের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রচলিত থাকিলেও মগধ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রভাব পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতেছিল।

৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ানচোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার ভারতবর্ষ পরিদর্শন কালে কান্যকুব্জের সুপ্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধন তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইউয়ানচোয়াং ১৫ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তৎকালে ভারতবর্ষের অবস্থা সর্ব্বাংশেই সুন্দর ছিল। তিনি হিন্দুদিগের সরলতা, সাধুতা, শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। প্রজারা ভূমির উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশমাত্র করস্বরূপে রাজকোষে প্রদান করিত। শ্রমজীবিগণ রাজসরকারে কার্য্য করিলে রীতিমত বেতন পাইত। ফল-কথা প্রজাগণ তৎকালে সুখে বাস করিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:o:—

হিন্দুদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য।

হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থা, শাসন প্রণালী প্রভৃতির বিষয় তোমরা জানিলে। এখন তোমাদিগকে হিন্দুগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সভ্যতা কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা বলিব।

ভাষা।—বেদসমূহ যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা অবিকল বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষা নহে। উভয় ভাষার মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। কালক্রমে বৈদিক ভাষার সংস্কার হইয়া বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার উদ্ভব হয়। সুশিক্ষিত লোকেই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। জনসাধারণের ভাষা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হইত। প্রদেশ ভেদে প্রাকৃত নানারূপ ছিল। প্রাকৃত হইতে ক্রমে বাঙ্গালা হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই সকল ভাষার সহিত সংস্কৃতের খুব নিকট সম্বন্ধ, কিন্তু দক্ষিণাপথে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে, তাহাদের সহিত সংস্কৃত ভাষার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সেগুলি আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা এখানে বাস করিত, তাহাদের ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসা প্রভৃতি বহু বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কেবল সংস্কৃতেই গ্রন্থ রচিত হইত। কিন্তু বৌদ্ধেরা জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সরল ও সহজবোধ্য প্রাকৃতভাষায় তাঁহাদের গ্রন্থাদি লিখিতেন। এই কারণে

বৌদ্ধযুগে পালিভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিত হয়। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন হইলে সংস্কৃতের পুনরভ্যুদয় হয়।

বর্ণমালা।—অক্ষর লিখিবার কৌশল অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মী লিপি নামে এক প্রকার

বুদ্ধদেবের ভস্মাধার (ব্রাহ্মী লিপির নিদর্শন)।

অক্ষর আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। সেই ব্রাহ্মী লিপি হইতে এদেশে ক্রমশঃ নানাবিধ অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। আবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে খরোষ্ঠী বর্ণমালার প্রচার ছিল। উহা ডাইন হইতে বামে লিখিত হইত। অশোকের অনুশাসন গুলিতে উভয় প্রকার অক্ষরেরই ব্যবহার দেখা যায়।

দর্শন শাস্ত্র।—ভারতে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হিন্দুদিগের ষড়দর্শন সমগ্র সভ্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ। আর্য্যবংশীয়গণ চিরকাল চিন্তাশীল। বেদের নানাস্থানে প্রাচীন আর্য্যজাতির চিন্তাশীল-

তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে ঈশ্বরের একত্ব, জগৎসৃষ্টি, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা আছে। ইহার পর কালক্রমে হিন্দুর ষড়দর্শনের উৎপত্তি হয়। (১) কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, (২) পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশাস্ত্র, (৩) গৌতম-প্রণীত ন্যায়দর্শন, (৪) কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক দর্শন, (৫) জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা, ও (৬) ব্যাস-প্রণীত উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত—এই ছয়টী দর্শন হিন্দুর ষড়দর্শন নামে অভিহিত। এই গুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই দর্শন গুলিকে অবলম্বন করিয়া উত্তরকালে অসংখ্য দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

সাহিত্য।—কাব্যশাস্ত্রে হিন্দুরা অদ্বিতীয় বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা তোমরা অবশ্যই জান। খ্রীষ্টের বহুপূর্ব্বে এই দুই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। বাল্মীকি রামায়ণের ও বেদব্যাস মহাভারতের রচয়িতা। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দু-গণের কবিত্বের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকি ও ব্যাসের পর মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ড-কাব্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিয়া সমগ্র সভ্যসমাজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রঘুবংশ, মেঘদূত, ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের তুলনা নাই। কালিদাসের পর অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি উত্তররামচরিত প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কান্যকুব্জের সুপ্রসিদ্ধ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে বাণভট্ট কাদম্বরী নামক সুন্দর গদ্য কাব্য রচনা করেন। কথিত আছে, কাশ্মীররাজ হর্ষদেব রত্নাবলী নামক নাটিকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন ভারবি প্রণীত কিরাতার্জ্জুনীয়, মাঘকবি প্রণীত শিশুপালবধ এবং শ্রীহর্ষ প্রণীত নৈষধচরিতও উৎকৃষ্ট কাব্য। আমাদের বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দের ন্যায় সুমধুর গীতিকাব্য অল্পই দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লণপণ্ডিত

রাজতরঙ্গিণী নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এখানি কাশ্মীরদেশের ইতিবৃত্ত।

হিন্দুরা অতিপ্রাচীন সময় হইতেই নানাপ্রকার নীতিপূর্ণ পশ্বাদি সংক্রান্ত গল্প রচনা করিয়া তদ্দ্বারা নীতিশিক্ষা দিতেন। বৌদ্ধদিগের জাতকগুলি এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে; ঐগুলি নীতিশিক্ষা দিবার জন্য রচিত গল্প মাত্র। অনেকের মতে জাতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষাও প্রাচীন। জাতক ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক গ্রন্থদ্বয় ঐরূপ গল্পের দ্বারা নীতিশিক্ষা দিবার জন্য রচিত। এই পুস্তক দুইখানি কালক্রমে পারসীক, গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

ব্যাকরণ।—ব্যাকরণশাস্ত্রে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ অধুনা ভারতবর্ষ-প্রচলিত প্রায় সমুদয় ব্যাকরণের মূল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, এই ব্যাকরণ খ্রীষ্টের অন্ততঃ আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আবার পাণিনির পূর্ব্বেও শকটায়ণ, ঐন্দ্র, চান্দ্র প্রভৃতি বহু প্রাচীন ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। ইহা হইতে হিন্দু ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বুঝা যায়।

গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষ।—প্রাচীন হিন্দুসমাজে গণিতচর্চ্চা ভালরূপই হইয়াছিল। পাটীগণিতের দশগুণোত্তর অঙ্কলিখন প্রণালী ভারতীয় হিন্দুদিগের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এই গণনাপ্রণালী অধুনা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের সমুদয় সভ্যসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণ সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ সম্যক্ অবগত ছিলেন। তাঁহারা বীজগণিতের এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের উদ্ভাবিত অনেক সঙ্কেত সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের অজ্ঞাত ছিল। আরববাসীরা ভারতীয়দিগের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং পরে ইউরোপে বীজগণিত ও দশগুণোত্তর প্রণালীর প্রচার করেন।

বৈদিক সময় হইতে আর্য্যেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন এবং

গ্রহাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহারা সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ইত্যাদি বিষয় ও উহার কারণ অবগত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে আর্য্যভট পৃথিবীর শূন্যে অবস্থান ও উহার আহ্নিক গতির বিষয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর গোলত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় সপ্রমাণ করেন। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব ও নির্ণয় করিয়াছিলেন।

চিকিৎসা ও রসায়ন-বিদ্যা।—চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন হিন্দুগণ সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। বেদের সময়েই ব্রাহ্মণগণ অনেক গাছ গাছড়ার গুণ পরীক্ষা করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতেন। কাল-ক্রমে স্বর্ণ, তাম্র প্রভৃতি ধাতু ও তদুৎপন্ন ভস্মাদি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। শল্য-চিকিৎসা বা অস্ত্র চিকিৎসায় হিন্দুরা বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছিলেন। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসকগণের গ্রন্থ আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইউরোপীয়গণ এখন যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলি ঐ সকল গ্রন্থে দেখা যায়। সুবিখ্যাত আরব সম্রাট হারুণ অল রসীদের সময় হিন্দু-চিকিৎসক মাণিক্য তাঁহার চিকিৎসা করেন। সেই চিকিৎসার ফলে সম্রাট্ আরোগ্য লাভ করেন। উক্ত সম্রাটের সময় ও তাহার পরবর্ত্তী কালে চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবদেশের গ্রন্থকার-গণের নিকট হইতে ইউরোপীয়গণ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হন। প্রাচীন ভারতে রসায়ন বিদ্যারও যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল। তাঁহারা দ্রাবকাদির যোগে ধাতু ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা নানাপ্রকার ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেন। বৌদ্ধযুগে নাগার্জ্জুনাদি রসায়ন-শাস্ত্রবিৎ এদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে রসায়ন সম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মৃতি।—বেদের নানা শাখাভেদে যাগযজ্ঞাদির প্রণালী ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শাখার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসূত্র রচিত হয়।

এই সকল সূত্র গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম্ম নীতি ও সমাজ-নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে ধর্ম্মসূত্রগুলির পরিবর্ত্তে স্মৃতিসংহিতাসমূহ প্রচলিত হইয়াছে। অদ্যাপি এই সকল স্মৃতিসংহিতার বিধান অনুসারে হিন্দুর আচার ব্যবহারাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। স্মৃতিসংহিতা সমূহের মধ্যে মনু প্রণীত সংহিতাই সর্ব্বপ্রধান।

রাজনীতি।—রাজ্যশাসন প্রণালী ও রাজার কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিগণ রাজনীতি শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কৌটিল্য বা চাণক্য তাঁহার অর্থ-শাস্ত্র নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তক হইতে হিন্দুরাজগণের শাসনপ্রণালী, প্রজাদিগের অবস্থা, দেশের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

চতুঃষষ্টি কলা।—সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রবিদ্যা, কারুকার্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতির নাম কলা। হিন্দুরা চৌষট্টিকলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

(ক) সঙ্গীত ও অভিনয়।—সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। বেদমন্ত্র গান করিতে হইত, কাজেই বৈদিককাল হইতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া হিন্দুগণ সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পশু ও পক্ষীদিগের স্বর হইতে সা, ঋ, গা, মা, প্রভৃতি সপ্তস্বরের নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এখন সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই উহা পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছে। অভিনয় কার্য্যেও প্রাচীন হিন্দুরা বিশেষ নিপুণ ছিলেন। নানা প্রকারের প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকই নাটক ও অভিনয়ের গুণাগুণ বুঝিতে পারিত। সংস্কৃত সাহিত্যে আটাইশ প্রকার নাটকের উল্লেখ দেখা যায়।

(খ) শিল্প।—নৃত্য, গীত, বাদ্য, অভিনয় প্রভৃতি কার্য্য ভিন্ন সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে ও নানাবিধ শিল্পে প্রাচীন ভারতীয়গণ অতুলনীয় ছিলেন।

চিত্রকর্ম্ম, মূর্ত্তি গঠনাদি কার্য্যে তাঁহাদের অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার ধাতুর বাসন, স্বর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কার ও লৌহাদি নির্ম্মিত

অজন্তা গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রস্থ চিত্র।

অস্ত্র-শস্ত্র গঠন, কার্পাস, পশম ও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি কার্য্যে প্রাচীন ভারতীয়েরা অদ্বিতীয় ছিলেন। ভারতীয় সূক্ষ্ম মস্‌লিন্ ও কৌষেয় বস্ত্র রোমক রমণীগণের অতি আদরের সামগ্রী ছিল। ভারতীয়

অশোক স্তম্ভ।

লৌহের সর্ব্বত্রই আদর ছিল, এমন কি ভারতীয় লৌহাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত।

(গ) স্থাপত্যবিদ্যা।—স্থাপত্য কার্য্যে হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পর্ব্বতের গুহায় বা পর্ব্বত কাটিয়া নানাবিধ কারুকার্য্যের সহিত প্রকাণ্ড গৃহ বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুগণ সভ্যজগতে প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দিরের কারুকার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর, মাদুরা, কর্ণাক, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি
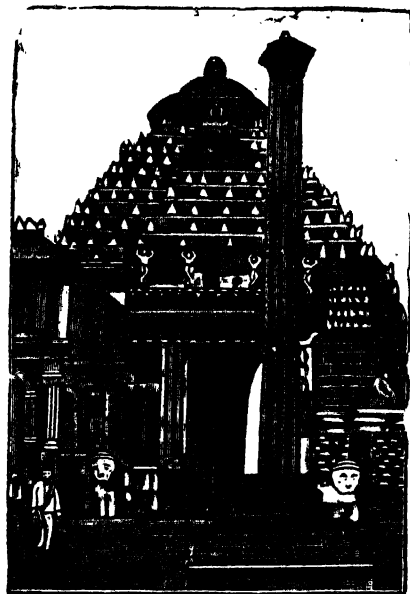
জগন্নাথের মন্দির।

স্থানের মন্দিরসমূহের নির্ম্মাণকৌশল অতীব চমৎকার। শুধু কারুকার্য্য নহে, প্রাচীন মন্দিরগুলির আকার ও উচ্চতা আজও লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে। জগন্নাথের মন্দিরটী ১৯২ ফুট উচ্চ। এতদ্ভিন্ন একখণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য ও পালিশ শিল্পবিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয়েরাও

প্রশংসা করেন। মন্দির ও স্তম্ভ ভিন্ন সিংহাদি পশু ও মনুষ্য মূর্ত্তির কারু-কার্য্যে প্রাচীন হিন্দুরা অতিশয় নিপুণ ছিলেন। সারনাথের অশোকস্তম্ভের উপরের চারিটী সিংহমূর্ত্তিযুক্ত চূড়া দেখিলে এখনও লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

যুদ্ধবিদ্যা।—আর্য্যদিগের যুদ্ধের নিয়মগুলির কথা বলিয়াছি, এখন যুদ্ধ প্রণালীর কথা বলিব। প্রাচীন আর্য্যেরা যুদ্ধ-বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। আলেক্জাণ্ডারের সময় তাঁহারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পদাতি সৈন্যেরা বর্শা, ঢাল, তীর ও ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিত। ধনুকগুলি মানুষের সমান লম্বা হইত এবং তীরন্দাজেরা ধনুকের একদিক এক পায়ের দ্বারা মাটিতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অপর দিক হাতে ধরিয়া তীর ছুড়িত। সে তীর লৌহের ঢাল পর্য্যন্ত ভেদ করিত। চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সৈন্যের কথা তোমরা জান। চন্দ্রগুপ্তের পরেও বহু হিন্দু রাজা অসংখ্য সৈন্য রাখিতেন ও দেশজয় করিতেন। মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুরা ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একতার অভাবে, অবশেষে পরাস্ত হন।

প্রাচীন হিন্দুজাতির সভ্যতা বিস্তার।—শান্তিপ্রিয় হইলেও হিন্দুজাতি উদ্যমবিহীন জড়ের ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিতেন না। তাঁহারা বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে নানা দূরদেশে গমন করিতেন, এবং নানাদেশে উপ-নিবেশ স্থাপন করিতেন ও ধর্ম্মপ্রচারে যত্নবান্ ছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহাদের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল।

(ক) বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে দূরদেশে গমন।—হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থে অর্ণবযান নির্ম্মাণ ও সমুদ্রযাত্রার কথা বর্ণিত আছে। তৎকালে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পক্ষেও সমুদ্রযাত্রা বা দূরদেশে ভ্রমণ দূষণীয় ছিল না; বণিক্‌গণ আপনাদের জাহাজে ভারতের পণ্যদ্রব্য লইয়া লোহিতসাগর,

প্রাচীন হিন্দুদিগের জাহাজ।

আরবসাগর ও ভারতমহাসাগরের উপকূলভাগে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। ভারতীয় বণিক্‌দিগের সহিত প্রাচীন ফিনীসিয়গণের পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইত। অনেকে মনে করেন যে য়িহুদী-সম্রাট্ সলোমনের ইতিবৃত্তে বর্ণিত বহু ধনশালী ওফীর প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ আভীর

প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থান নহে। এই আভীর প্রদেশ হইতে সলোমনের রাজ্যে বানর, ময়ূর, গজদন্ত প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু প্রেরিত হইত। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে প্রাচীন ভারতীয় বণিক্‌গণ বভেরু বা বাবিলন দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন; এখনও 'বভেরু জাতক' নামে একটী জাতক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার সিংহলের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়কুমার খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নাম হইতে ঐ দ্বীপের সিংহল নাম হয়। ফা-হিয়ানের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি হিন্দু জাহাজে ভারত হইতে যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঐ জাহাজটীর আকারও বিশেষ বড় ছিল। তাহাতে প্রায় ২০০ আরোহী ও বহু পণ্যদ্রব্য ছিল।

এইগুলি ভিন্ন হিন্দুদিগের বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে দূরদেশে গমনের আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা গ্রীকগণের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে অবগত হই যে খ্রীষ্ট জন্মিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় বণিকগণ, বাণিজ্য-সূত্রে আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে গমন করিতেন এবং গার্দ্দাফুই অন্তরীপে আরবদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত তাঁহাদের পণ্যের আদান প্রদান হইত। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে হিন্দু বণিক্‌গণ স্বর্ণ, হস্তিদন্ত, মসলা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য স্বদেশে লইয়া আসিতেন। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার ও দেশ আবিষ্কারকের মতে হিন্দুরাই সর্ব্বপ্রথমে নীলনদের উৎপত্তি স্থানে গমন করিয়া ঐ দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পর্ত্তুগীজ নাবিক বাস্কো-ডা-গামা প্রথমে ভারতে আসেন, তখন হিন্দু বণিকেরাই তাঁহাকে পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে পথ দেখাইয়া ভারতে আনয়ন করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরেও অনেক দূর পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের গতিবিধি ছিল।

যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি ছাড়াইয়া তাঁহারা যে চীন ও জাপান পর্য্যন্ত গমন করিতেন তাহারও প্রমাণ আছে।

কিন্তু এত গেল প্রাচীন কালের কথা। ক্রমে স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের উৎসাহ ও উদ্যমের লোপ হইতে লাগিল। তাঁহারা আত্ম-রক্ষার্থ স্বদেশে থাকিতে বাধ্য হইলেন ও ক্রমে তাঁহাদের ভারতের বাহিরে যাইবার প্রবৃত্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে সমুদ্রযাত্রা অতি দূষণীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমানকালে ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতীয় উদ্যম ফিরিয়া আসিতেছে।

(খ) উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন।—শুধু বাণিজ্য সূত্রে দূর-দেশে গিয়াই আর্য্যেরা ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহারা দূরবর্ত্তী অনেক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা তোমরা জান। সিংহলের ন্যায় যবদ্বীপে ও পূর্ব্ব-উপদ্বীপে ভারতীয়দিগের অনেক উপনিবেশ ছিল। ফা-হিয়ানের সময় সমস্ত যবদ্বীপ ও তন্নিকটস্থ বালি ও অন্যান্য অনেক দ্বীপেই হিন্দুরাজ্য স্থাপিত ছিল। এখনও ঐ সকল স্থানে বহু হিন্দু মন্দিরের ও বৌদ্ধ বিহারাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। যবদ্বীপের ভাষা সংস্কৃতমূলক ও উহাতে রামায়ণ মহাভারতের কথা বর্ণিত আছে। যবদ্বীপে এখনও প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দুর বাস আছে। আর বালি দ্বীপে এখনও হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত।

স্থলপথেও হিন্দুরা বহুদেশে গমন করিতেন এবং ভারতের নিকটে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। পারসীক, গ্রীক ও রোমক সৈন্যদলে অনেক ভারতবাসী কার্য্য করিতেন। এমন কি অনেকের মতে, রোমক অধিকারের সময় হিন্দু যোদ্ধারা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আবার ইতিহাস হইতে জানা যায় যে—ডেরায়সের গ্রীস আক্রমণ কালে পারসীক সৈন্যদলে হিন্দুরা ধনুর্ব্বাণ লইয়া গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সময়ে ভারতীয় হিন্দুর প্রাধান্য বর্ত্তমান ভারতের সীমা

অপেক্ষা বহু বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকাদির সময় সমস্ত আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান হিন্দুদিগের অধীন ছিল, এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী-পর্য্যন্ত কাবুল প্রদেশ হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্ব্বেও ঐরূপ সমস্ত পূর্ব্ব-উপদ্বীপ হিন্দুদিগের করতলস্থ ছিল। সম্প্রতি ফরাসী প্রত্নতত্ত্ব-বিৎদিগের চেষ্টায় কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু হিন্দু রাজার তাম্র-শাসন ও বহু হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। শ্যাম রাজ্যে এখনও অনেক হিন্দু কীর্ত্তি ও হিন্দু আচারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(গ) ধর্ম্মপ্রচার ও সভ্যতার বিস্তার।—প্রাচীন আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-প্রচারের কথা বিশেষ বর্ণিত নাই। তবে বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতের বাহিরে বহুদূর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় পূর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া সাইবিরিয়া, তাতার, পারস্য, এসিয়ামাইনর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত হয়।

ধর্ম্ম-প্রচার ও বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হয়। দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ চীন ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ইহার বহু পরে যখন আরব জাতি ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত করতঃ পশ্চিম এসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তদ্দেশস্থ মনীষিগণ অতি যত্নের সহিত ভারতীয় শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন-পূর্ব্বক ভারতীয় সভ্যতা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। হারুণ-অল্-রসিদ ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী খলিফাদিগের সময় অনেক হিন্দু পণ্ডিত খলিফার সভায় আমন্ত্রিত হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরববাসিগণ এই সকল শাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর করিতেন। মধ্যযুগে তাঁহারাই ইউরোপের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের হাত দিয়া ভারতীয় সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে প্রচলিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

—:o:—

পাঠান শাসনকাল।

ভারতে মুসলমান অধিকার।—হিন্দুজাতির অবনতির সময় মুসলমানগণ এদেশ কেমন করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তোমরা জান। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু প্রথম পাঁচশত বৎসরের মধ্যে তাঁহারা সিন্ধু ও পঞ্জাব ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মোহম্মদঘোরী কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে মুসলমান আধিপত্যের সূত্রপাত হয় এবং সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সাম্রাজ্যের আকার কখন ক্ষুদ্র, কখন বৃহৎ হইত; সাম্রাজ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তিকালেও অনেক হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুশক্তি আবার এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ইংরাজশক্তির অভ্যুদয়ে সে আশা বিলুপ্ত হয়।

হিন্দুশাসনকালের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, এইবার মুসলমান শাসনকালের কথা বলিব। মুসলমান শাসনকাল দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) পাঠান শাসনকাল, ও (২) মোগল শাসনকাল। প্রথমে পাঠান শাসনকালের কথা বলিয়া পরে মোগলশাসনকালের কথা বলিব।

পাঠান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ।—পাঠান রাজগণ বিদেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময় অনেক মুসলমান নানাদেশ হইতে

আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করেন। ভারতবর্ষবাসী হিন্দুদিগের সহিত এই নবাগত মুসলমান রাজ্য ও মুসলমান অধিবাসীদিগের আচারব্যবহারাদি বিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল। এই কারণে পাঠান রাজাদিগের রাজ্য-শাসনের প্রথম অবস্থায় মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় নাই। কালক্রমে বহুদিন একত্র বাস বশতঃ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের সূত্রপাত হয়। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর ক্রমে পাঠান রাজগণ হিন্দু প্রজাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন, এবং পাঠান রাজত্বের শেষভাগে হিন্দু অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই রাজসরকারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

পাঠানরাজগণের শাসনপ্রণালী।—পাঠান রাজাদিগের রাজ্য-শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচারমূলক ছিল। রাজা রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। প্রজাবর্গের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। অবশ্য রাজা মুসলমানধর্ম্মসঙ্গত আইন অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ রাজাকে কোন আইনে বাধ্য করা প্রজাদিগের সাধ্য ছিল না। সুতরাং রাজার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মনের বল থাকিলে তাঁহার শাসনে প্রজার মঙ্গল হইত, নতুবা প্রজার মঙ্গল একপ্রকার অসম্ভব ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে রাজার ক্ষমতা কার্য্যতঃ রাজধানী ও অন্যান্য নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। রাজধানী হইতে দূরস্থ পল্লীগ্রাম সমূহের অধিবাসীরা সাধারণতঃ রাজার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইত না। সুতরাং রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই রাজক্ষমতার বাহিরে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজার এই উপদ্রবহীন অবস্থা সদ্বৃত্ত ও প্রজারঞ্জক রাজাদিগের সময়েই কার্য্যতঃ দেখা যাইত। রাজা দুর্ব্বৃত্ত ও প্রজাপীড়ক হইলে রাজধানীর সন্নিহিত বা রাজধানী হইতে দূরস্থ কোন স্থানের প্রজারই অব্যাহতি ছিল না।

বড় বড় সহরে পাঠান রাজাদিগের সেনানিবেশ থাকিত। সুতরাং রাজধানী ও অন্যান্য বড় বড় সহরের সন্নিহিত প্রজারা সৈন্যদিগের অত্যাচারের ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড় হইয়া থাকিত। দূরের লোকদিগের এ সকল আশঙ্কা ততদূর ছিল না। ফলতঃ প্রজারা রাজসরকারে যথাসময়ে খাজনা দাখিল করিতে পারিলেই রাজা আর তাহাদের খোঁজ খবর লইতেন না। পাঠান রাজাদিগের মধ্যে অনেকেই নিজের বিলাস ও আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেন। প্রজার ভালমন্দের বিষয় তাঁহাদিগের মনে স্থান পাইত না। এই সকল কারণে পাঠান রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পল্লীসমাজ অব্যাহত অবস্থায় ছিল এবং পল্লীবাসিগণের আচার ব্যবহার প্রভৃতি পালনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই।

মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার।—পাঠান রাজাদিগের রাজত্বকালে অনেক হিন্দু, মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। অনেক মুসলমানও

নানক

নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়া পাঠানরাজাদিগের অধিকৃত প্রদেশ-সমূহে বাস করিতে থাকে। এই প্রকারে পাঠান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু প্রজাদিগের রাজসরকারে জিজিয়া নামক কর দিতে হইত। মুসলমান প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত না। সুতরাং অনেক দরিদ্র হিন্দু প্রজা জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। মুসলমানেরা জাতিভেদ মানেন না, সেই জন্য অনেক নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু সামাজিক উন্নতির আশায় মুসলমান হইয়াছিল। কেহ কেহ বা রাজসম্মান বা রাজসভায় উচ্চপদ পাইবার আশায় স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যেন মনে করা না হয় যে, সকলেই স্বার্থের খাতিরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। অনেকেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিত। মুসলমান পীর ও অন্যান্য সাধু-গণের ধর্ম্মোপদেশ ও পবিত্র জীবন অনেককে ইসলাম ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, অনেক সময় হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোর অত্যাচার হইত। নানা স্থানে মুসলমানগণ হিন্দু-দিগের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হিন্দুরাও অনেক সময় মুসলমান-বিদ্বেষ প্রকাশ

চৈতন্য।

করিত। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অনেকদিন একত্র বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছিল। পাঠান রাজত্বকালেই মহাত্মা কবীর, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই এক সূত্রে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পাঠান রাজত্বকালের স্থাপত্য।—পাঠান রাজাদিগের রাজত্বকালে রাজধানী দিল্লী নগরীতে বহুসংখ্যক সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া
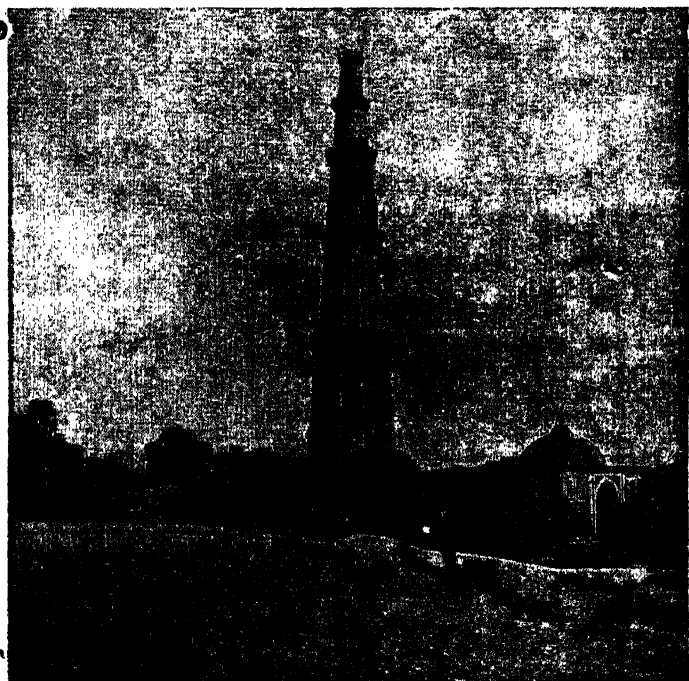
কুতব মিনার।

ছিল। দাসবংশীয় পাঠান সুলতান কুতবদ্দিন ও আলতামাসের সময় কুতবমিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভ উহার ভিত্তি হইতে ২৫০ ফুট উচ্চ। পাঠান রাজ্যের অবসানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল রাজ্যে স্থাপত্যকার্য্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। জৌনপুরের আতালা মস্‌জিদ্‌, পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ্‌, গৌড়ের সোণা মস্‌জিদ্‌, বীজাপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোল গুম্বজ অদ্যাপি পাঠানজাতির কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

উর্দ্দু ভাষা।—পাঠান রাজাদিগের রাজত্বের সময় ভারতবর্ষে এক নূতন ভাষার উদ্ভব ও প্রচলন হয়। এই ভাষার নাম উর্দ্দু ভাষা। উর্দ্দু শব্দে সেনানিবেশ বা বাজার বুঝায়। সেনানিবেশ বা বাজারে নানা দেশের লোক সমবেত হইয়া এক প্রকার বিমিশ্র ভাষায় পরস্পর কথোপ-কথন করিয়া থাকে। পাঠান রাজগণ আফগানিস্তানের অধিবাসী। ইঁহাদের সঙ্গে পারস্য দেশ হইতেও অনেক লোক আসিয়াছিল; ভারতবর্ষে আসিয়া এই সকল লোককে ভারতবাসীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইয়াছিল। কাজে কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ ক্রমে ক্রমে আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাসমূহের পরস্পর মিশ্রণে একটী নূতন ভাষার উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এই মিশ্রিত ভাষার নাম উর্দ্দু ভাষা। ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশের লোকেই অধুনা উর্দ্দু ভাষা কিছু না কিছু বুঝিতে পারে। সুতরাং এই ভাষা দ্বারা ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পাঠান রাজাদিগের রাজত্বকালে উর্দ্দু ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। পাঠান রাজত্বের সময়ে ফারসী ও উর্দ্দু উভয় ভাষাই আদালতে ব্যবহৃত হইত।

পাঠানদিগের সময়ে সাহিত্য।—পাঠান রাজত্বকালে সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। পাঠান রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে অনেক হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত

নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে আধুনিক ভাবে ইতিহাস লিখিবার প্রথা ছিল না। সুতরাং ভারতবর্ষীয় হিন্দু পণ্ডিতদিগের লিখিত ভাল ইতিহাস গ্রন্থ নাই। কিন্তু পাঠান রাজত্বকালে অনেক মুসলমান পণ্ডিত সুন্দর ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া যেসকল ইতিহাস লিখিয়াছেন, তৎপাঠে সেই সেই সময়ের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে ইবন্ বাতোতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি আফ্রিকার উত্তরাংশ হইতে আসিয়া সুলতান মোহম্মদ তোগ্লকের রাজসভায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। তিনি মোহম্মদ তোগ্লকের রাজ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যদিও রাজ্য সে সময়ে খুব সমৃদ্ধিশালী বোধ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, রাজ্যের শীঘ্রই বিলোপ হইবে। সমসাময়িক লোকের ইতিহাস যে বিশ্বাসযোগ্য, এই লেখকের ইতিহাস দ্বারাই তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে। পাঠান রাজত্বকালের অন্যান্য মুসলমান লেখকগণের মধ্যে ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন ও কবি আমীর খসরুর নাম সাহিত্যানুরাগিগণের নিকট বিশেষ পরিচিত।

এই সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। মাধবাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদের ভাষ্য ও অন্যান্য নানা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের বাঙ্গালা দেশেও অনেক গুলি প্রধান পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক।

পাঠানদিগের পতনের কারণ।—পাঠান রাজত্ব এদেশে ৩০০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। এই তিনশত বৎসরের মধ্যে আবার ৫টি রাজবংশ এদেশে রাজত্ব করেন।

পাঠানেরা বাহুবলে এদেশ শাসন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দুই এক জন ব্যতীত দেশে সুশাসন প্রাণালী স্থাপনের চেষ্টা কোন পাঠান নরপতিই করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু প্রজাদিগের রাজভক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সৈন্যবলে রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেন। এদিকে পাঠান সর্দ্দারগণের মধ্যে রাজভক্তির বিশেষ অভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ একটু প্রবল হইলেই স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ যতদিন রাজা প্রবল থাকিতেন ততদিন লোকে তাঁহাকে মানিত, আর তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইলে, প্রজারা বিদ্রোহী হইত, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীন হইতেন ও সুবিধা পাইলে রাজাকে অপসারিত করিয়া নিজেরাই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

ইহার উপর গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে বাস করিয়া ও সুখভোগে মত্ত হইয়া পাঠানগণ বিলাসী ও হীনবল হইয়া পড়িলেন। হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধেও তাঁহাদের অনেক শক্তি ক্ষয় হইল। এই সুযোগে মোগলেরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া পাঠান সাম্রাজ্য আরও দুর্ব্বল করিয়া দিল। শেষে মোহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে পাঠান সাম্রাজ্যের অনেকাংশই স্বাধীন হইয়া পড়িল। পাঠানদিগের যেটুকু ক্ষমতার অবশেষ ছিল, তৈমুরের ভীষণ আক্রমণে ও অত্যাচারে তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। দিল্লীর সাম্রাজ্য ক্ষীণবল হইয়া পড়িলে, পাঠানগণ একতার অভাববশতঃ আর রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:o:—

মোগল শাসনকাল।

মোগল শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ।— ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্য প্রায় আড়াইশত বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে তখন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ের মুসলমানগণ আপনাদিগকে বিদেশী বলিয়া মনে করিতেন না। তখন ভারতভূমিই মুসলমানের মাতৃভূমি হইয়াছিল। এইজন্য কালক্রমে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আচারব্যবহারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হিন্দুগণ পোষাক পরিচ্ছদ ও কথোপকথন সম্বন্ধে মুসলমানদিগের রীতির কিছু কিছু অনুকরণ করিয়াছিল। আবার মুসলমানগণও হিন্দুর আচারব্যবহারের কতক অনুকরণ করিয়াছিল। আকবর বাদসাহ অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না, হিন্দুরা উপযুক্ত হইলেই তাহাদিগকে উন্নত রাজপদে নিযুক্ত করিতেন। এমন কি, তিনি হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধও স্থাপন করিয়াছিলেন। আকবরের শাসনগুণে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিজেতৃবিজিতভাব ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছিল এবং রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু প্রজাগণের সাহায্যে সাম্রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। আকবরের পরে জাহাঙ্গীর ও সাজাহান এই উদারনীতির অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্যের উন্নতিরক্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির ফলে এই সদ্ভাবের শৈথিল্য হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর পুনঃসংস্থাপিত করিয়া হিন্দুদিগকে রাজকার্য্য হইতে বিদূরিত করিয়া ও তাহাদের মন্দিরাদি

ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আকবর, রাজপুত প্রভৃতি হিন্দুজাতির সাহায্যে যে প্রকাণ্ড রাজ্যের সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া তাহার বিলোপসাধন করিয়াছিলেন।

মোগলসাম্রাজ্যের শাসনপ্রণালী।—আকবরের সময় মোগল সাম্রাজ্য ১৫টি সুবায় বিভক্ত হইয়াছিল। পরে অবস্থা অনুসারে সুবার সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইত। প্রত্যেক সুবায় এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত থাকিতেন। এই শাসনকর্ত্তা সুবাদার বা নবাব নামে অভিহিত হইতেন। সুবাদারগণ নিজ নিজ সুবার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুবার রাজস্ব আদায় করিয়া সম্রাটের সরকারে দাখিল করিতে পারিলেই সুবাদার নিশ্চিন্তভাবে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিতেন, সম্রাট্ আর তাঁহার কার্য্যের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। ক্রমে মোগলসাম্রাজ্যের অবনতির সময় সুবাদারদিগের ক্ষমতা এতদুর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, পিতার সুবাদারী উত্তরাধিকারক্রমে পুত্র পাইতেন। কালক্রমে এই সকল সুবাই স্বাধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

প্রত্যেক সুবায় রাজস্ব আদায়-প্রভৃতি কার্য্যের জন্য একজন করিয়া দেওয়ান নিযুক্ত থাকিতেন। ফৌজদার বা সেনাপতি সুবার শান্তিরক্ষা করিতেন। বিচারালয়ে কাজী সাহেব আইন ব্যাখ্যা করিতেন ও মোকদ্দমা চালাইতেন, মীর-ই-আদল্ বিচার করিতেন। সহরের শান্তি-রক্ষার ভার-কোতয়ালের হস্তে অর্পিত ছিল। পল্লীগ্রাম সমূহের প্রায় সমুদয় কার্য্যই চিরন্তন প্রথা অনুসারে পল্লীসমাজ সমূহের দ্বারা অথবা জমিদারদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত।

জায়গীরদার ও জমিদার।—মুসলমান সাম্রাজ্যে অনেক জায়-গীরদার ছিলেন। মুসলমান সম্রাট্গণ অনেক সময় গুণবান্ কর্ম্মচারী বা

আকবরের অধিকৃত
ভারতবর্ষ।
কাবুল
দিল্লী
রাজপুতনা
এলাহাবাদ
উড়িষ্যা
গোলকুণ্ড

প্রিয়পাত্রদিগকে ভূমি দান করিতেন। এই প্রকার ভূসম্পত্তির নাম জায়গীর। জায়গীরদারগণ তাঁহাদের উপস্বত্ব হইতে যৎকিঞ্চিৎ রাজসরকারে দাখিল করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জায়গীর ভোগদখল করিতেন। সম্রাট্ আকবরের পূর্ব্বে প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীদিগকে বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর প্রদত্ত হইত। এই প্রকারে জায়গীরের সংখ্যা ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে রাজস্বের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে থাকে। সম্রাট্ আকবর এই প্রথা রহিত করিয়া সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দুর্ব্বলপ্রকৃতি বাদসাহ আকবরের প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মের অনুসরণ করিতে সাহসী হইতেন না। সুতরাং জায়গীরের সংখ্যা না কমিয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ও অন্যান্য অনেক প্রদেশে অনেকগুলি জমিদারও ছিলেন। প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিয়া রাজসরকারে পাঠাইয়া দেওয়াই জমিদারদিগের কার্য্য ছিল। অনেক সময় পরাক্রান্ত জমিদারগণ অন্য জমিদার বা জায়গীরদারদিগের সহিত কলহ বিবাদ ও যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতেন। বলবান দুর্ব্বলের জমিদারী বা জায়গীরের অংশ কাড়িয়া লইতেন। অবশেষে সুবাদারকে উপহার দিয়া বা অধিক খাজনা দিবার অঙ্গীকার করিয়া গোলযোগের নিষ্পত্তি করিতেন। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে জায়গীরদার ও জমিদারগণ প্রজার উপর সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা নিজ অধিকারমধ্যে নিজেরাই শান্তিরক্ষা করিতেন, নিজেরাই অপরাধীর শাস্তিবিধান করিতেন, নিজেরাই পুলিশের ব্যবস্থা করিতেন; সাধারণতঃ বাদসাহ বা সুবাদার তাঁহাদিগের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না।

রাজস্ব।—প্রজাদিগের অধিকৃত ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রভূত রাজস্ব আদায় হইত। সেরসাহের সময় উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত, আকবরের সময় হইতে এক

তৃতীয়াংশ রাজস্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। এতদ্ভিন্ন নানা উপায়ে যথেষ্ট টেক্সও আদায় হইত। নদী প্রভৃতিতে নৌকার মাস্থল, নানাবিধ ব্যবসায়ের মাস্থল, হাটবাজারের কর প্রভৃতি হইতে অনেক রাজস্ব আদায় হইত। একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই সকল টেক্স রহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের ঘোষণা সত্বেও উক্ত টেক্সসমূহের ষোল আনা আদায় করিয়াছিলেন। ফলকথা, ভূমিকর ও টেক্স আদায় সম্বন্ধে মোগলশাসনের সময়ে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার হইত। সুবাদার ও জমিদারগণ দরিদ্র প্রজাদিগের নিকট যথেচ্ছ কর আদায় করিতেন। রাজসরকারে যথাসময়ে রাজস্ব দাখিল করিতে পারিলে সম্রাটেরা প্রজাদিগের উপর অত্যাচারের বিষয় শুনিয়াও শুনিতেন না। অনেক সময় টাকার প্রয়োজন হইলে তাঁহারা জমিদারী ও জায়গীর সমূহ নীলামে বিক্রয় করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিক রাজস্ব দিতে স্বীকার করিলেই লোকে রাজ-সরকার হইতে জমিদারী বা জায়গীর পাইতে পারিত, পরে দুর্ভাগ্য প্রজাদিগকে শোষণ করিয়া কর আদায় করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কারণ এরূপ স্থলে সম্রাটেরা জায়গীরদারদিগের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরাজ দূত সার টমাস রো এবং সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের এই দুর্দ্দশার বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আর্থিক অবস্থা।—মুসলমান রাজত্বের সময়ে এদেশে নানাবিধ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল, কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অল্প থাকাতে তাহার মূল্য এখন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, অর্থাৎ অল্প টাকায় অনেক দ্রব্য কিনিতে পারা যাইত। বাজারে সামান্য দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কড়ি ও 'দাম' নামে এক প্রকার তাম্রমুদ্রা চলিত। এইজন্য এখনও চলিত

তাবার মূল্য অর্থে দাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। চল্লিশ দামে এক টাকা হইত। নগদ টাকার অভাবে প্রজারা রাজকর দিবার কালে অনেক সময়

আওরঙ্গজেবের স্বর্ণমুদ্রা।

আকবরের স্বর্ণমুদ্রা।

টাকার পরিবর্ত্তে শস্য দিত। জিনিসপত্র এত সস্তা ছিল যে শুনিলে হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। আফ্রিকাদেশীয় ভ্রমণকারী ইবন্ বাতোতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তাঁহার পরিচিত এক মুসলমান বণিক, পত্নী ও ভৃত্য সহ কিছুদিন বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন; বৎসরে বার টাকায় তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময় যখন সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, তখন চাউলের দর টাকায় আটমণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। তখনকার নবাব, বাদসাহ, রাজা মহারাজেরা বিলাসী হইলেও জনসাধারণের মধ্যে

কিছুমাত্র বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই। মোটা ভাত মোটা কাপড় পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইত। দেশের উৎপন্ন শস্যাদি বড় বেশী রপ্তানি

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা।

(রাশি সমূহের ছাপযুক্ত)।

হইত না, ভাল রাস্তা ঘাটের অভাবে রপ্তানির তেমন সুবিধাও ছিল না। সুতরাং সাধারণতঃ দেশে বড় অন্নকষ্ট ছিল না। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে কোথাও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার হইত। কারণ যেমন ভাল যান ও পথের অভাবে রপ্তানির সুবিধা ছিল না, তেমনই আমদানিরও সুবিধা ছিল না। এক প্রদেশের ধান চাউল লইয়া গিয়া অন্য প্রদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে বাঁচান দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ফলতঃ সময়ে সময়ে এমন হইত যে, এক প্রদেশে প্রচুর শস্য জন্মাইলেও অন্য প্রদেশের লোক অনাহারে মরিত।

কলা ও শিল্প।—মুসলমানদিগের সময়ে সঙ্গীত, চিত্র-বিদ্যা প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, গালিচা, সতরঞ্চ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এদেশ মুসলমানগণের নিকট

শ্রেণী। এই সময়ে সূক্ষ্ম শিল্পের খুব আদর ছিল,—স্বর্ণ ও জহরতের অলঙ্কার, শাল দোশালা, সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি দ্রব্যের কারিকরেরা যথেষ্ট উৎসাহ পাইত। মোগলদিগের স্থাপত্যের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া
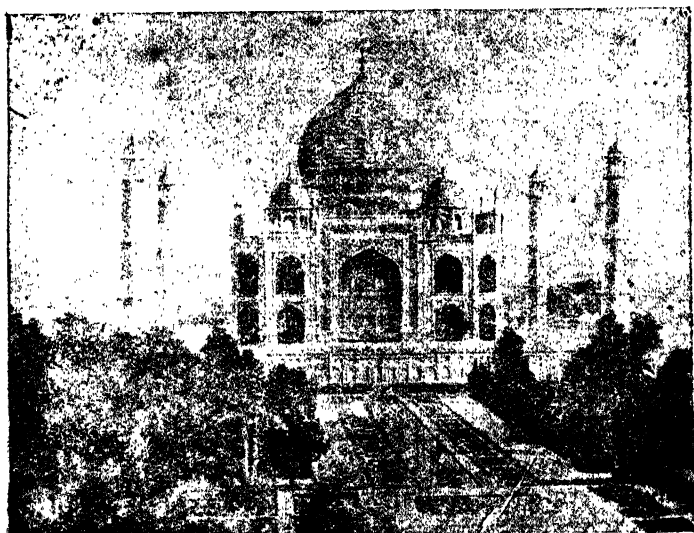
আগরার তাজমহল।

থাকা যায় না। আগরার তাজমহল, মতি মসজিদ, দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস ও জুম্মা-মসজিদ প্রভৃতি যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি মোগলদের অদ্ভুত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ-কৌশলের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

সাহিত্য।—মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালে ফৈজী ও তাঁহার ভ্রাতা আবুলফাজেল, ফেরিস্তা, আব্দুলকাদের বদায়ুনী, কাফি খাঁ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মুসলমান সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। ফেরিস্তা সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি আকবরের সময় পর্য্যন্ত মুসলমান রাজত্বের একখানি সুন্দর ইতিহাস
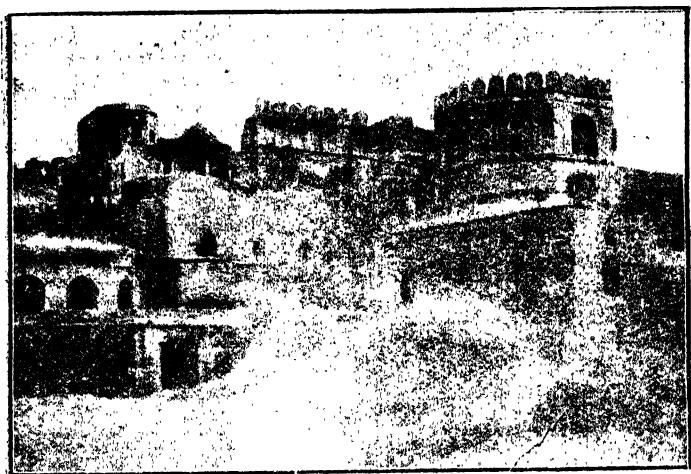
ফতেপুর সিক্রীর পুরাতন দুর্গ।

লিখিয়া গিয়াছেন। ফয়াজী, আবুলফাজেল, আব্দুলকাদের বদায়ুনী আকবরের সভার অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। ফয়াজী ও বদায়ুনী অনেক দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বদায়ুনীর রচিত ইতিবৃত্ত হইতে আমরা মোগল রাজত্বের অনেক কথা জানিতে পারি। আবুলফাজেলের লিখিত সুপ্রসিদ্ধ আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থদ্বয়ে আকবরের রাজত্ব-কালের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল মোহম্মদ হাশিম। ইনি নিজের সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন। আওরঙ্গজেব ইতিহাস লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইনি ইঁহার গ্রন্থ গুপ্তভাবে রচনা করেন। এইজন্য ইনি 'কাফি' বা গুপ্ত এই নামে সাধারণে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনেক হিন্দুও (বিশেষতঃ কায়স্থমুন্সি) ফারসী ভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

আকবরের রাজসভা।

মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠা প্রভৃতি দেশীয় ভাষারও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডী কাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি এই সময়ে লিখিত হয়। হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ ও মরাঠা ভাষায় সাধু তুকারামের 'অভঙ্গ' (বা স্তোত্র)ও এই সময়ে বিরচিত হয়।

বৈদেশিকগণ বর্ণিত মোগল সাম্রাজ্যের বিবরণ।—মোগল-রাজত্বের সময়ে অনেক ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের তৎকালীন অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে মোগল সাম্রাজ্যের নানা বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

(ক) সার টমাস রো।—সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সার টমাস রো ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা প্রথম জেম্‌স্ কর্ত্তৃক দূতস্বরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। সার টমাস ভারতবর্ষে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্বয়ং বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপরাধীদিগকে

জাহাঙ্গীর।

কঠিন দণ্ড দিবার সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং সুরাপান করিতেন, কিন্তু প্রজাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সুবাদারগণ সম্পূর্ণরূপে রাজকীয় ক্ষমতার অধীন ছিলেন না। দেশে প্রজার ধন-সম্পত্তি বিপৎশূন্য ছিল না। সুবাদারগণ প্রজাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই অত্যাচার করিতেন। প্রজাগণ বড়ই দরিদ্র ছিল। রাজপুত

রাজগণ সম্রাটের পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষে শিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর প্রজার প্রতি বিশেষতঃ

মোগল দরবার।

(জনৈক ওলন্দাজ কর্ত্তৃক অঙ্কিত পুরাতন চিত্র হইতে গৃহীত)

ইউরোপীয় আগন্তুক অভ্যাগতদিগের প্রতি, সদয় ব্যবহার করিতেন। সার টমাস মোগল সভার সমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

(খ) বার্ণিয়ে।—১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে ফরাসীজাতীয় ভ্রমণকারী বার্ণিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন; এই সময়ে আওরঙ্গজেব পিতা সাজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ে আওরঙ্গজেব ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের বিবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের রাজসভায় কিছুকাল চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,

এবং ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর রাজসভায় অবস্থান করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মোগল রাজসভার ও মোগল রাজ্যের

আওরঙ্গজেব।

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আওরঙ্গজেব অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক ছিলেন, রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত কেহই ছিল না। তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বাংশে চাউল, রেশম, তুলা, নীল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিত এবং রাজ্যের অনেক অংশেই শিল্পকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। প্রজাদিগের বিশেষ কষ্ট ছিল না, কিন্তু অনেক প্রদেশে শাসনকর্ত্তারা প্রজাদিগের প্রতি বড়ই উপদ্রব করিতেন। রাজ্য হইতে সম্রাটের প্রভূত রাজস্ব আদায় হইত। আওরঙ্গজেবের অধীনে অনেক রাজপুত সামন্ত রাজা ছিলেন। রাজপুতেরা সকলেই রণনিপুণ ছিল। বাদসাহের বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। সৈন্যদলের মধ্যে বিস্তর রাজপুত, মোগল ও পাঠান

নিযুক্ত ছিল। রাজ্যে গুলিগোলাও যথেষ্ট ছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ে ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ পারস্য, তুরস্ক, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম প্রভৃতি নানা-দেশে রপ্তানি হইত।

মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ—সম্রাট্‌ আকবরই মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন। তাঁহার উদারনীতির ফলে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সহিত বৈরভাব ভুলিয়া প্রকৃত রাজভক্ত প্রজায় পরিণত হইয়াছিল। নানা উপায়ে আকবর তাহাদের সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, কখনও তাহাদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এবং ঘৃণিত জিজিয়া কর রহিত

আকবর।

করিয়াছিলেন। আকবরের উদারতার ফলেই দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত ও অন্যান্য রণদুর্ম্মদ হিন্দুজাতি শৌর্য্যে ও বাহুবলে তাঁহার সাম্রাজ্যবর্দ্ধনে প্রয়াসী

হইয়াছিল। এই কারণে আকবরের জীবদ্দশায় ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে, মোগল সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত, সুশাসিত ও প্রবল হইয়া উঠে। সাজাহানের পর তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে হিন্দুগণের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল। এই অত্যাচারের ফলে হিন্দুপ্রজাগণ ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইল। তাহাদের রাজভক্তি বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে নিরুপায় হইয়া তাহারা প্রকাশ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল এবং চারিদিকে অশান্তির চিহ্ন দেখা দিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর অধীনে মরাঠাজাতির অভ্যুদয় হইল এবং উত্যক্ত হইয়া রাজপুতেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। ইহাতেও সম্রাটের চৈতন্য হইল না, তিনি প্রকৃত কথা বুঝিয়াও বুঝিলেন না; তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ যেন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তিনি বাহুবলে হিন্দুদিগকে পদদলিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন। ফলে হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সাম্রাজ্য ক্ষীণবল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল।

তাঁহার মৃত্যুর পর আবার সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার পুত্রগণ পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য একে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আত্মবিচ্ছেদে রাজশক্তি আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। রাজশক্তির ক্ষীণতার সহিত মরাঠা, জাঠ ও অন্যান্য হিন্দুজাতিগুলি মাথা তুলিয়া প্রবল হইয়া উঠিল ও সাম্রাজ্যের অনেকাংশ অধিকার করিয়া লইল। এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করিলেন। মন্ত্রীরাও এই সময়ে নিজ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে সম্রাটকে করতলগত করিয়া তাঁহার রাজস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং সুবিধা পাইলেই সম্রাটকে বধ করিয়া কোন শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রকৃত রাজ ক্ষমতা নিজেদের হস্তে লইতে আরম্ভ করিলেন।

এই সকল মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্রে সাম্রাজ্য আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং

সুযোগ পাইয়া নাদিরসাহ ও আমেদ সাহের ন্যায় বিদেশীয় শত্রুগণ বারম্বার ভারতাক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে ভারতের অবস্থা।— এইরূপে মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ রাজ্যে বিভক্ত হইল। ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতে অযোধ্যা-প্রদেশ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি লইয়া তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নবাব সাদত আলি খাঁ এক বিশালরাজ্য স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁ আপনার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেন। এবং দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা চিনক্লিচ খাঁ স্বাধীন হইয়া নর্ম্মদা ও কৃষ্ণার অন্তর্ব্বর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। চিনক্লিচ খাঁ 'নিজাম-উল মূলুক' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'নিজাম রাজ্য' নামে খ্যাত হয়। হায়দরাবাদে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সকল মুসলমান রাজ্য ভিন্ন এই সময় অনেক স্বাধীন হিন্দু রাজ্যও সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মরাঠা রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই মরাঠাদের কথা একণে তোমাদিগকে বলিব।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:০:—

মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুদয় ও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা।

শিবাজীর মৃত্যুর পর মরাঠা রাজ্যের অবস্থা।—তোমরা সকলেই জান যে শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্থাপয়িতা। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রবল শক্রর আক্রমণেও মহারাষ্ট্র রাজ্য বিনষ্ট হইল না। দূরদর্শী শিবাজী রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজা, অপারক, নাবালক, কাপুরুষ বা অত্যাচারী হইলেও যাহাতে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয় এইজন্য তিনি ৮ জন বিশিষ্ট লোক লইয়া একটী মন্ত্রিসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং রাজকার্য্য বিভাগ করতঃ এক একজন মন্ত্রীর উপর এক এক কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী রাজ্যের শাসন কার্য্য দেখিতেন, সেনাপতি যুদ্ধ করিতেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভুজী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নিজ চরিত্রদোষে ও অবিবেকতার ফলে পরাস্ত হইয়া আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইলেন ও প্রাণ হারাইলেন। শম্ভুজীর পুত্র সাহু মোগলহস্তে বন্দী থাকায় শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম রাজা হইয়া কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন। অতঃপর সাহুকে মোগলেরা ছাড়িয়া দিলে সাহু সাতারার রাজা হইলেন। এদিকে রাজারামের পুত্রও কোলাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ফলে মহারাষ্ট্র রাজ্য বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

ইহার উপর সাহু অত্যন্ত বিলাসী ও রাজকার্য্যবিমুখ হওয়ায় দেশের শাসনকার্য্যের ও যুদ্ধ চালাইবার প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে আসিল মন্ত্রিদিগের মধ্যে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন।

কৌশলে সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজ হস্তে লইলেন এবং প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নেতা হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।
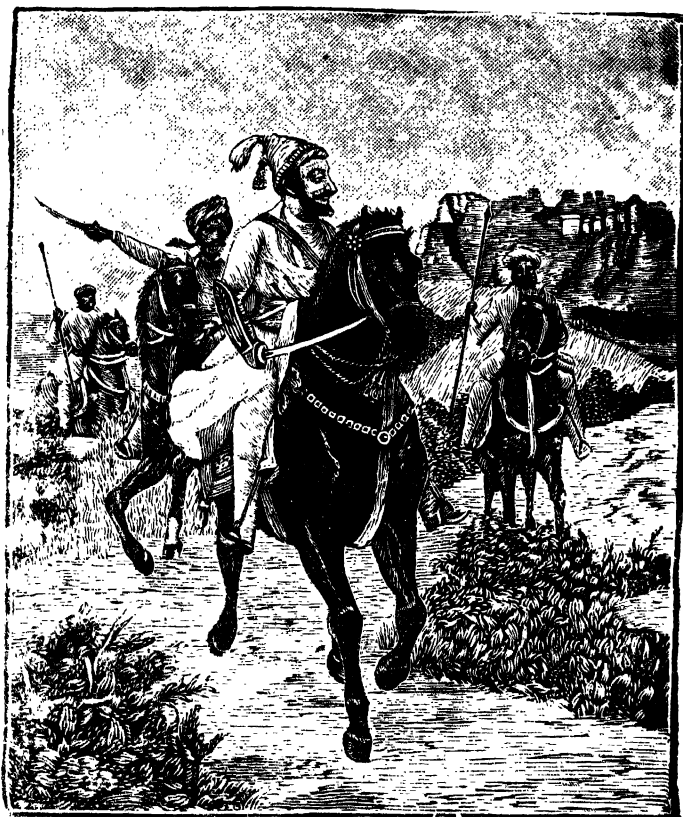
শিবাজী।

পেশোয়ার প্রাধান্য।—বালাজীর পুত্র বাজীরাও অসাধারণ ক্ষমতাশালী ও রণকুশল ছিলেন। তিনি সাতারায় অপদার্থ সাহুকে নামে মাত্র রাজা রাখিয়া পুনায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং রণজি সিন্ধিয়া,

মলহররাও হোলকার প্রভৃতি সামন্তের অধীনে অসংখ্য সৈন্য লইয়া রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। মোগল সম্রাট্ বাধ্য হইয়া মালবপ্রদেশ মরাঠা-

দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মালবজয়ের পর তিনি গুজরাট জয় করিলেন এবং ঐ প্রদেশে নিজ কর্ম্মচারী পিলাজী গায়কবাড়কে স্থাপিত করিলেন। ওদিকে নাগপুরের ভোঁসলাবংশ মধ্যভারতের অনেক

স্থান জয় করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ বংশীয় রঘুজী ভোঁসলা বঙ্গদেশ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীখাঁকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু রঘুজীও বাধ্য হইয়া পেশোয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন।

এইরূপে পেশোয়ার নেতৃত্বে ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া পড়িল। মরাঠাগণের আক্রমণের ভয়ে বঙ্গদেশের নবাব, রাজপুত রাজগণ, এমন কি নিজাম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চৌথ বা রাজস্বের এক চতুর্থাংশ কর দিতে বাধ্য হইলেন। বাজীরাওএর শেষদশায় ও তাঁহার পুত্র বালাজী বাজীরাওএর সময় মরাঠাদিগের ক্ষমতা আরও বাড়িল এবং তাহারা পঞ্জাব ও দিল্লীপ্রদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতে স্বাধীন মরাঠা রাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইল।

মরাঠাদিগের পতন।—কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনায় মহারাষ্ট্রীয়গণের আশা কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে আফগানরাজ আমেদসাহ আবদালী পানিপথক্ষেত্রে মরাঠাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে অসংখ্য মরাঠা সৈন্য, সেনাপতি ও প্রধানপুরুষগণ নিহত হইলেন। পরাজিত হইয়া মরাঠাগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিল না। যদিও আবার কয়েক বৎসরের মধ্যে মরাঠা সামন্তগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া হিন্দুস্থানের অনেক অংশ জয় করিয়াছিলেন, তথাপি মরাঠা-দিগের সে ক্ষমতা আর ফিরিয়া আসিল না; তাহারা ক্রমে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং পেশোয়ার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হোলকার, সিন্ধিয়া, গায়কবাড়, ভোঁসলা প্রভৃতি সামন্তগণ নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নামে মাত্র পেশোয়ার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময় স্বার্থান্ধ হইয়া পেশোয়ারই বিপক্ষতাচরণ করিতেন। এইরূপে একতার অভাবে মহারাষ্ট্রীয় শক্তির পতন হইল। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মরাঠাগণের পরিবর্ত্তে ইংরাজেরা ভারতের অধীশ্বর হই-

লেন। ইংরাজেরা বাণিজ্যার্থে এদেশে আসিয়া কেমন করিয়া শৌর্য্য, বীর্য্য ও বুদ্ধিবলে দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন, অতঃপর সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব

সপ্তম অধ্যায়।

-:o:-

ইউরোপীয়দিগের আগমন।

ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য।—অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় বণিকদিগের সহিত প্রাচীন ফিনীসিয়গণের পণ্য দ্রব্যের আদান প্রদান হইত। এই ফিনীসিয়গণ ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বোপকূলস্থ সীরিয়া প্রদেশের অধিবাসী ছিল। প্রাচীনকালে ইউরোপের বাণিজ্য ইহাদিগেরই করতলগত ছিল। ভারতজাত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রথমে আরব দেশে প্রেরিত হইত ও তথা হইতে ফিনীসিয় বণিকগণ কর্ত্তৃক ইউরোপ, পশ্চিম এসিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নানাস্থানে নীত হইত; গ্রীক সম্রাট্ আলেক্জাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পর হইতে ইউরোপের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয় ও গ্রীকদিগের সহিত ভারতীয়দিগের সাক্ষাৎ ভাবে নানারূপ আদানপ্রদান চলিতে থাকে। আলেক্জাণ্ডার ফিনীসিয়ার প্রধান বন্দর টায়ার নগর ধ্বংস করিয়া মিশর দেশে নীলনদের মোহানায় আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করিলে, ভারতীয় পণ্য দ্রব্য সকল এই নূতন বন্দরে লইয়া আসা হইত ও তথা হইতে সেগুলি ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ ইউরোপের বন্দর সমূহে প্রেরিত হইত। সেকালে ইউরোপে ভারতজাত রেশম, তুলা, বস্ত্র, মশলা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির বিশেষ আদর ছিল ও এই

সকল দ্রব্য অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, স্বর্ণের সহিত রেশমের সমান মূল্য ছিল, এবং এক সের মরিচ এক গিনি মূল্যে বিকাইত।

কালক্রমে ভারতের সহিত ইউরোপের এই বাণিজ্য আরবদেশের বণিকগণের হস্তগত হয়। তাহারা ভারতে আসিয়া মশলা প্রভৃতি কিনিত এবং তাহা বিনিস, জেনোয়া প্রভৃতি ইটালির অন্তর্গত বন্দর সমূহের বণিক-গণের নিকট বিক্রয় করিত। ইটালির বণিকগণ আবার সেই মাল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণি, সুইডেন প্রভৃতি ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের দেশ সমূহে অতি উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হইত। কিন্তু ক্রমে এই সকল দেশের অধিবাসিগণের চক্ষু ফুটিল। তাহারা ভাবিল যে, যদি তাহারা এরূপে অপরের হাত দিয়া মাল না লইয়া নিজেরাই ভারতে আসিয়া মাল লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য এত অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে না; কিন্তু এক ভূমধ্যসাগরের পথ ভিন্ন ভারতে আসিবার অন্য পথ তাহাদের জানা ছিল না। অথচ সে পথের পশ্চিমদিক্‌টা ইটালির বণিকদিগের ও পূর্ব্বদিক্‌টা মুসলমানদের অধিকারে ছিল। বিশেষতঃ মুসলমানেরা মিশর ও তুরস্ক অধিকার করাতে খ্রীষ্টীয়ান্‌ বণিকদিগের পক্ষে সে পথ একরূপ বন্ধ হইয়াই গেল। তাহারা ভূমধ্যসাগরের আশা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার জন্য অন্য পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইল।

ইউরোপীয়গণের ভারতে আসিবার চেষ্টা।—কিন্তু তখন ইউরোপীয়দিগের ভৌগোলিক জ্ঞান অতি অল্পই ছিল এবং তাহারা নানা-প্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে তাহাদের ধারণা ছিল যে, আটলাণ্টিক মহাসাগর অপার এবং বিষুবরেখার নিকটস্থ স্থানের বায়ু এত উত্তপ্ত যে উহাতে মনুষ্য দগ্ধ হইয়া যায়। এই সমস্ত কুসংস্কার তাহাদের

মনে এত বদ্ধমূল ছিল যে, যদি কেহ উহার প্রতিবাদ করিত তাহা হইলে সে হাস্যাস্পদ বা দণ্ডনীয় হইত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নানা কারণে ইউরোপীয় সভ্যতার নব-বিকাশ উপস্থিত হইল এবং তদ্দেশবাসিগণ কুসংস্কার ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া নানা উপায়ে আত্মোন্নতির প্রয়াসী হইল। সঙ্গে সঙ্গে মহা-সমুদ্রেও অনেক নাবিক সাহসের সহিত অভিযান করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালবাসিগণই এই কার্য্যে পথ প্রদর্শন করিল। ঐ দেশীয় রাজকুমার হেনরী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের পার্শ্বস্থ সমুদ্রে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। তাঁহার পর অনেক নাবিক ঐ কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগালদেশীয় নাবিক বার্থলোমিউ ডায়াজ আফ্রিকার উপকূল বাহিয়া আটলান্টিক মহাসাগর পথে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আসিলেন।

কিন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কারের পরও ইউরোপীয়গণ ভারতের পথ ও অবস্থান সম্যক্‌রূপে বুঝিত না। তাহাদের মধ্যে নানা লোকের মনে নানা প্রকার ধারণা ছিল। কেহ বা বলিত যে উত্তর মহাসাগর দিয়া পূর্ব্বদিকে জাহাজ চালাইয়া উহা পার হইলেই ভারতবর্ষ পাওয়া যাইবে। কেহ বা বলিত যে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইলেই ভারতে যাওয়া যাইবে।

এই শেষোক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জেনোয়াদেশীয় নাবিক কলম্বস ভারত আবিষ্কার কার্য্যে স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বহু অনুনয়ে স্পেন রাজ্ঞী তাঁহাকে তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ও লোক জন অর্থ দিলেন। কলম্বস তাহা লইয়া ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে যাইতে লাগি-লেন। কলম্বসের পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশের অস্তিত্ব কেহ জানিত না। কাজেই কলম্বস মনে করিয়াছিলেন যে সমুদ্র দিয়া বরাবর চলিয়া গেলে

তিনি ভারতে উপস্থিত হইবেন। বহুদিন জাহাজ চালাইবার পর তিনি এক নূতন দেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভারতে উপস্থিত হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বিশাল আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয়গণের উপনিবেশ স্থাপনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিলেন।

পর্ত্তুগীজদিগের ভারতে আগমন।—দক্ষিণ দিকে সমুদ্রযাত্রা করিলে সহজেই ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইতে পারে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ নাবিক বাস্কো-ডা-গামা, ডায়াজের ন্যায়, আফ্রিকার পশ্চিম পার্শ্ব বাহিয়া চিরাকাঙ্ক্ষিত পথ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করিলেন। প্রায় এগার মাস কাল জলযাত্রার পর উত্তমা

বাস্কো-ডা-গামা।

অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের মেলিন্দা বন্দরে উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় সুরাটের বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বাস্কো-ডা-গামাকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে

লইয়া আসিলেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মে তারিখে বাস্কো-ডা-গামা মলবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উপনীত হইলেন। কালিকটের 'জামোরিণ' উপাধিধারী রাজা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে ছয় মাস থাকিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহার ফিরিবার সময় জামোরিণ পর্ত্তুগালের রাজার নামে তাঁহাকে এক পত্র দিলেন, তাহাতে তিনি লিখিলেন,—"আপনার দূত বাস্কো-ডা-গামা এখানে আসিয়া আমাকে প্রীত করিয়াছেন। আমার রাজ্যে দারুচিনি, লবঙ্গ, আর্দ্রক, মরিচ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি এই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার রাজ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।" কিন্তু এই সময়ে আরবদেশের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত। তাহারা বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নবাগত বিদেশী পর্ত্তুগীজদিগের প্রতি বিলক্ষণ ঈর্ষ্যান্বিত হইল এবং জামোরিণের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের বিবাদ বাধাইয়া দিল। ফলে ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে বাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জামোরিণের শত্রু কোচিনের রাজার সহিত সন্ধি করিলেন এবং আরবদিগের অনেকগুলি জাহাজ ধ্বংস করিয়া দিলেন।

পর্ত্তুগীজগণের উন্নতি ও অবনতি।—পর্ত্তুগীজেরা ভারতবর্ষে ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তৎকালে জলযুদ্ধে এদেশে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের প্রতিযোগিগণ পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইল। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ যোদ্ধা ও শাসনকর্ত্তা আলবুকার্ক ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ অধিকারের বিশেষ উন্নতি হয়। আলবুকার্ক গোয়ানগরী ও পারস্যোপ-সাগরের উপকূলবর্ত্তী অর্ম্মজ বন্দর অধিকার করেন। পর বৎসর মালাক্কা-দ্বীপ গৃহীত হয়। এইরূপে পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্য পশ্চিমে অর্ম্মজ হইতে পূর্ব্বে মালয় উপদ্বীপ ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর

পর্ত্তুগীজগণ বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসেন ও হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন।

কিন্তু নানাকারণে পর্ত্তুগীজদিগের সৌভাগ্য অধিকদিন স্থায়ী হয় নাই। পর্ত্তুগীজেরা অনেক সময় ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের সহিত অতিশয় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। তাহারা লোকজনকে বিনা মজুরিতে খাটাইয়া লইত, জোর করিয়া খ্রীষ্টান করিত, নানাস্থানের সমুদ্রপথে দস্যু-বৃত্তি করিত এবং অনেক স্থান হইতে স্ত্রীলোক, বালক ধরিয়া লইয়া যাইত। শীঘ্রই তাহাদিগকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইল। তাহাদের অত্যাচারের ফলে বঙ্গদেশের সুবাদার ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয়গণের নিকট তাহারা পরাজিত হইতে লাগিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগাল স্পেনের অধীন হওয়ায় তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হইল। অধুনা ভারতবর্ষে গোয়া, দমান ও দিউ এই তিনটী স্থানমাত্র পর্ত্তুগালের অধিকারভুক্ত আছে।

ওলন্দাজদিগের আগমন।—ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ওলন্দাজ বা ডচেরাই এ অঞ্চলে পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্যের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ান। পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদের নিকট হইতে এসিয়াজাত মাল কিনিয়া ইংরাজ প্রভৃতি উত্তর-ইউরোপবাসিগণের নিকট বিক্রয় করিতেন; কিন্তু স্পেন রাজ্যের সহিত পর্ত্তুগাল সংযুক্ত হইবার পর স্পেন-রাজ ওলন্দাজদিগের নিকট মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন ওল-ন্দাজেরা আপনারাই ভারতের পথ খুঁজিতে লাগিলেন এবং উত্তরে পথ আবিষ্কার করিবার অনেক নিষ্ফল চেষ্টার পর, অবশেষে তাহারা পর্ত্তুগীজদের আবিষ্কৃত পথে ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণীলিয়স হুটমান নামক একজন ওলন্দাজ যবদ্বীপে আসিয়া বণ্টামের সুল-তানের সহিত সন্ধি করিয়া গেলেন এবং ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ 'ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত হইল। বিশ বৎসরের মধ্যে ওলন্দাজেরা সিংহল, সুমাত্রা, যব প্রভৃতি ভারত সাগরীয় দ্বীপগুলিতে প্রাধান্য স্থাপন করিলেন, এবং এই সকল স্থানে উৎপন্ন লবঙ্গ, দারুচিনি মশলা বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন।

ইংরাজেরাও এই সময় এ অঞ্চলে আসিয়া বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাদের লাভের অংশীদার হয়, ইহা ওলন্দাজদের অসহ্য হইল এবং ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে আম্বোয়ানা নামক স্থানে তাঁহারা নিষ্ঠুর-ভাবে তাঁহাদিগের ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নিহত করিলেন। ইহার পর ইংরাজেরা ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করিয়া ভারত ভূমিতে আসিয়া বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ওলন্দাজেরাও ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মান্দ্রাজ উপকূলস্থ নাগাপত্তন, বাঙ্গালার অন্তর্গত চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের আড়ত সংস্থাপিত হয়। এখানে উভয়জাতির মধ্যে স্বার্থ লইয়া আবার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ওলন্দাজেরা ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের নিকট সর্ব্বত্র পরাজিত হন। এই সূত্রে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া চুঁচুড়া অধিকার করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ওলন্দাজদিগের সমুদয় অধিকার ইংরাজের হস্তগত হয়। অধুনা ভারতবর্ষের কুত্রাপি ওলন্দাজ-দিগের অধিকার নাই। কেবল চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি পুরাতন গির্জা ও গোরস্থান পূর্ব্বতন ওলন্দাজ অধিকারের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে।

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।—পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ হইতে অনেক ইংরাজ নাবিক উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আসিবার জন্য চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সার ফ্রান্সিস ড্রেক জলপথে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপ হইয়া যান। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে টমাস ষ্টিফেন্‌স্ নামক একজন ইংরাজ পাদ্রি ভারতবর্ষে

আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ইংরাজ ভারত ভূমিতে পদার্পণ করেন নাই। ইহার চারি বৎসর পরে চারিজন ইংরাজ বণিক স্থলপথে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে পর্ত্তুগীজদের হস্তে নানারূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজগণ নানা কারণে ওলন্দাজদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইংরাজেরা ঐ সময়ে ওলন্দাজগণের নিকট হইতে এদেশজাত মাল কিনিতেন। ওলন্দাজেরা নানাবিধ মশলা তাঁহাদের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিতেন। কিন্তু উহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা মরিচের দর চড়াইয়া তিন শিলিং পাউণ্ডের স্থলে একেবারে আট শিলিং পাউণ্ড হিসাবে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ আচরণে বাধ্য হইয়া ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে সংকল্প করিলেন। এবং উহার ফল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিনে রাজ্ঞী এলিজাবেথের অনুমত্যনুসারে ইংরাজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত হইল।

ইংরাজদিগের ভারতে আগমন।—কোম্পানি সংস্থাপিত হইবার পর ক্রমে ইংরাজ বণিকগণ ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টার সর্ব্বপ্রথমে সুমাত্রাদ্বীপে একটী বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ঈর্ষান্বিত ওলন্দাজগণ ইংরাজ বণিকদিগকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে আম্বোয়ানা নগরের হত্যাকাণ্ডের পর, ইংরাজগণ ভারত সমুদ্রীয় দ্বীপপুঞ্জের ভরসা ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় মনোনিবেশ করেন, একথা তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পূর্ব্বে ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে করমণ্ডল উপকূলস্থ পেত্তাপল্লী ও মছলিপত্তনে ইংরাজদিগের কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই কুঠী দুইটীই তাঁহাদের এদেশে প্রথম কুঠী। ইহার দুই বৎসর পরে পর্ত্তুগীজেরা সুরাটের নিকট সোয়ালী নামক স্থানে জল

যুদ্ধে ইংরাজদিগের নিকট পরাজিত হন এবং সুরাটে ইংরাজগণের বাণিজ্য বিস্তার হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ জাহাঙ্গীর বাদসাহের নিকট সার টমাস রো নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দূতরূপে প্রেরণ করেন, তাহা তোমরা জান। সম্রাট্, রোর ব্যবহারে প্রীত হইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সুরাট ও অন্য কয়েকটী স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন। এই সকল আড়তে ইংরাজগণ বিলাত হইতে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র, বনাত প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিতেন এবং দেশীয়দিগের নিকট হইতে রেশম, কার্পাস প্রভৃতি কিনিয়া বিলাতে প্রেরণ করিতেন।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা।—এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ইংরাজদের কোন দুর্গ ছিল না। কিন্তু এদেশের তখনকার যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইংরাজেরা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে অন্ততঃ একটী দুর্গ না থাকিলে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কালে তাঁহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হইবে। সুতরাং ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা চন্দ্রগিরির রাজার এক সামন্তের নিকট হইতে পূর্ব্ব উপকূলস্থ মাদরাসা পত্তন নামে এক স্থান ক্রয় করিয়া তথায় ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরের উৎপত্তি হইল।

বোম্বাই উপকূলে সুরাটনগরে ইংরাজ বণিকদিগের প্রধান আড়ত ছিল। কিন্তু ঐস্থানে তাঁহারা মরাঠাদিগের লুণ্ঠনের ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন এবং তাপ্তী মুখে ক্রমশঃ বালি পড়ায় বাণিজ্যেরও বিশেষ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্ল্‌সের নিকট বোম্বাই দ্বীপ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় চার্ল্‌স তাঁহার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ উহা পর্ত্তুগালের রাজার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন বোম্বাই দ্বীপের অবস্থা অতি জঘন্য ছিল। সুতরাং রাজা দ্বিতীয় চার্লস বার্ষিক ১০ পাউণ্ড মাত্র কর লইয়া কোম্পানিকে দ্বীপটী অর্পণ করিলেন। কোম্পানি এই দ্বীপ প্রাপ্ত হইয়া উহাকেই

তাঁহাদের পশ্চিম উপকূলস্থ প্রধান বাণিজ্যস্থানে পরিণত করিলেন ও তথায় একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন।

বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইয়া ইংরাজেরা প্রথমে উড়িষ্যাস্থিত পিপ্‌লি নামক স্থানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সাজাহানের সনন্দ বলে সুরাটের কুঠীর অধীনে এই স্থানে কোম্পানির এক কুঠী সংস্থাপিত হয়। ক্রমশঃ কোম্পানি বালেশ্বর, হুগ্‌লি, পাটনা, কাশিম-বাজার, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবাদার সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালার এলাকাভুক্ত তাঁহাদের সমুদয় কুঠী অধিকার করিয়া লইবার হুকুম জারি করেন। ইহার ফলে ইংরাজ-গণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়াতে হুগলির কুঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণক বাঙ্গালা হইতে সমস্ত মালপত্র ও ইংরাজ-গণকে লইয়া মান্দ্রাজে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থলে পরাজিত হইলেও জলে ইংরাজদের কিরূপ প্রভাব তাহা সম্রাট্ বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহা-দের হস্ত হইতে ভারতীয় পণ্যজাহাজ ও মক্কাযাত্রীদিগকে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সুতরাং আওরঙ্গজেব বাধ্য হইয়া ইংরাজ-দিগের প্রতি সদয় হইলেন, এবং বাৎসরিক তিন হাজার টাকা মাত্র শুল্ক লইয়া কোম্পানিকে বঙ্গদেশে বাণিজ্যাধিকার দিলেন (১৬৯০)।

সন্ধির পর জব চার্ণক আর হুগলিতে না ফিরিয়া উহার পনের ক্রোশ দক্ষিণে সুতানুটি নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেন। অতঃপর ইংরাজেরা তথায় এক দুর্গ নির্ম্মাণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সে সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের জমিদার শোভাসিংহের বিদ্রোহে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজেরা সুতানুটীর কুঠী সুরক্ষিত করিবার জন্য সুবাদারের অনুমতি চাহিলেন। সুবাদার অনুমতি দিলে তাঁহারা তথায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং

ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমউশ্বানের নিকট হইতে সুতানুটী, গোবিন্দপুর, ও কলিকাতা এই তিন গ্রাম ক্রয় করিয়া লইলেন। এইরূপে বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর সূত্রপাত হইল।

ফোর্ট উইলিয়ম।

ফরাসীদিগের আগমন।—ইউরোপের অন্যান্য জাতির ন্যায়, ফরাসীরাও বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের কোম্পানি সংস্থাপিত হয় ও ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা বিজাপুরের রাজার নিকট হইতে মান্দ্রাজের প্রায় ৪৬ ক্রোশ দক্ষিণে একটী স্থান ক্রয় করিয়া পঁদিচেরী নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৬৮৮ অব্দে ইঁহারা সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে চন্দননগর প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে মলবার উপকূলস্থ মাহী ও পূর্ব্ব-উপকূলস্থ কারিকল নামক স্থানদ্বয় তাঁহাদের অধিকারে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কর্ণাট

প্রদেশে ইংরাজদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধের অবসানে ফরাসীরা পরাজিত হন, এবং ইংরাজেরা ভারত-ভূমিতে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই সকল যুদ্ধের কথা তোমাদিগকে বলা হইবে। অধুনা পঁদিচেরী, চন্দননগর, মাহী, কারিকল প্রভৃতি কয়েকটী সামান্য স্থানমাত্র ফরাসীদিগের অধিকারভুক্ত আছে।

দিনেমারগণের আগমন।—১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারেরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া করমণ্ডল উপকূলে ট্রাঙ্কুইবরে ও বঙ্গে শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা ডেন্‌মার্কের নিকট হইতে এই দুই স্থান ক্রয় করিয়া লন। অধুনা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দিনেমার-দিগের অধিকার নাই।

অষ্টম অধ্যায়।

ইংরাজ ও ফরাসীর সংঘর্ষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণাপথের অবস্থা।—সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়া পড়ে। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ মোহম্মদ সাহের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিজাম উল্-মুলক স্বাধীন হইয়া সুবিশাল হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি করমণ্ডল উপকূলস্থ কর্ণাট প্রদেশে শাসন করিবার জন্য আর্কটে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। নিজামের এই প্রতিনিধি আর্কটের নবাব নামে অভিহিত হইতেন। তিনি একরূপ স্বাধীনভাবে কর্ণাট শাসন করিতেন। পশ্চিম দিকে মরাঠাগণ খুব প্রবল হইয়া উঠিতেছিল ও সর্ব্বত্র চৌথের দাবী

করিতেছিল। পেশোয়াগণ মালব হইতে গোয়ানগরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঞ্জোর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল। ত্রিচিনপল্লীতেও একটী হিন্দুরাজ্য ছিল, কিন্তু ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কটের নবাব দোস্ত আলির জামাতা চাঁদ সাহেব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে রাজ্য অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন 'পলিগার' বা'নায়ক' উপাধিধারী কতিপয় অর্দ্ধ স্বাধীন হিন্দু রাজা কতক গুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিতেছিলেন। এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসী এই উভয় জাতি ভারত ভূমিতে প্রাধান্য স্থাপন জন্য পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি।—পঁদিচেরীর ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহাদের উদ্যম ও চেষ্টার ফলে পঁদিচেরী একটী প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং তাঁহাদের মনে এদেশে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা বলবতী হয়।

দাক্ষিণাত্য তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা রাজ্যে বিভক্ত এবং দেশীয় রাজগণ সকলেই আপন আপন প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যস্ত। ফলে নিয়তই তাঁহাদের মধ্যে কলহ হইত। ফরাসীগণ বুঝিতে পারিলেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া এই কলহে যোগদান করিতে পারিলে ফরাসীদিগের রাজ্যও প্রতিপত্তি বর্দ্ধনে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

এইরূপ বুঝিয়া তাঁহারা ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজপদপ্রার্থী এক ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে তাঁহাদের কারিকল বন্দর লাভ হয়।

এই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রতিপত্তি বর্দ্ধনের আর এক সুযোগ উপস্থিত হইল; ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠাগণ কর্ণাট আক্রমণ করে। কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে

পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ও কন্যা (চাঁদ সাহেবের পত্নী) ধন রত্নাদি লইয়া পঁদিচেরীর ফরাসী গবর্ণর ডুমা সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন।
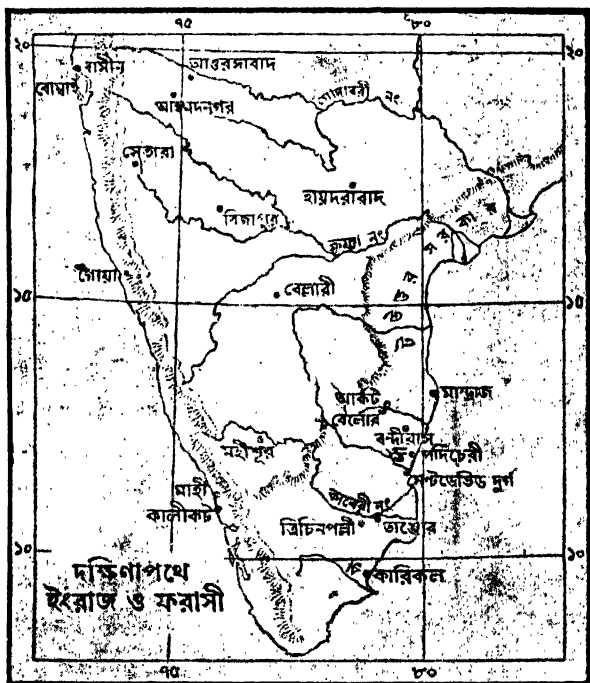
ডুমা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। অতঃপর দোস্ত আলির পত্নীকে বন্দী করিয়া তাঁহার সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিবার জন্য মরাঠা সেনাপতি রঘুজি ভোঁসলা পঁদিচেরীর সমক্ষে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন এবং দোস্ত আলির পত্নী ও কন্যাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ডুমাকে আদেশ করিলেন ও তাহা না করিলে যুদ্ধ করিবেন এই ভয় দেখাইলেন।

ডুমা বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি অগণ্য মরাঠা সৈন্যের ভয়ে ভীত

হইলেন না এবং দৃঢ়তার সহিত বলিয়া পাঠাইলেন, "এই দুইটী রমণী ফরাসী-রাজের আশ্রিতা। ইহাদের রক্ষার জন্য ভারতের সমস্ত ফরাসী প্রাণ দিবে, তথাপি কাপুরুষের ন্যায় আশ্রিতাদ্বয়কে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিবে না।" ডুমার এই বাক্যে মরাঠারা পঁদচেরী আক্রমণে সাহসী হইল না এবং রঘুজি সসৈন্যে বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

ইহার ফলে এদেশে ফরাসীদের প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। সকলেই তাহাদিগকে বীরজাতি বলিয়া সম্মান করিতে লাগিল ও ডুমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। হায়দরাবাদের নিজাম ডুমাকে বহুমূল্য খেলাৎ দিলেন এবং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে ডুমা পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং তাঁহার স্থানে এক সূক্ষ্মদর্শী কুটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক পঁদিচেরীর গবর্ণর নিযুক্ত হন।

ডুপ্লে।—পঁদিচেরীর এই নবাগত শাসনকর্ত্তার নাম ডুপ্লে। ইহার পূর্ব্বে এত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বহুদর্শী ইউরোপীয় রাজনৈতিক এদেশে আসেন নাই। পঁদিচেরীতে আসিবার পূর্ব্বে ডুপ্লে চন্দননগর কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ও উৎসাহে চন্দননগরের অশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের অবস্থা দেখিয়া ডুপ্লে বুঝিলেন যে, যে সময় একটু চেষ্টা করিলেই ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপন করা যাইতে পারে। আত্ম-কলহরত দেশীয় নরপতিগণ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিবেন না। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রকৃত সৈন্যবল ছিল না। অনেক রাজার বহুসহস্র সৈন্য ছিল বটে, কিন্তু শিক্ষা ও উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রের অভাব বশতঃ উহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্যই হইত না। এদেশে ফরাসী সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না, কিন্তু ডুপ্লে দেখিলেন যে, ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত হইলে দেশীয় সৈন্যও ইউরোপীয়দের মত যুদ্ধকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হয় এবং অল্পসংখ্যক হইলেও অনায়াসে দেশীয় রাজগণের বহুসংখ্যক সৈন্যকে

বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় দেশীয় সৈন্য গুলিকে ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত করিতে পারিলে অনায়াসে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই মনে করিয়া ডুপ্লে একদল সুশিক্ষিত দেশীয় সেনা গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চাশা পূর্ণ হইবার একমাত্র অন্তরায় ইংরাজ জাতিকে এদেশ হইতে বিদূরিত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। শীঘ্রই এক সুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডুপ্লে।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ।—ডুপ্লে পঁদিচেরীতে আসিবার তিন বৎসর পরে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজদের সহিত ফরাসীদের যুদ্ধ বাধিল এবং পঁদিচেরী অবরোধ করিবার জন্য ইংরাজদিগের কয়েকখানি জাহাজ করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হইল। তখন ডুপ্লে কর্ণাটের নবাব আনোয়ার-উদ্দিনকে উপঢৌকন দিয়া এই প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার

রাজ্যে ইংরাজ ও ফরাসীর পরস্পর বিবাদ হইতে না দেন। নবাব ডুপ্লের কথা মত কার্য্য করিলেন, ইংরাজদিগকে যুদ্ধ করিতে দিলেন না। কিন্তু ইহার পরে ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি লাবোর্ডোনের কর্ত্তৃত্বাধীনে কয়েকখানি ফরাসী রণতরি উপস্থিত হইয়া মান্দ্রাজ গ্রহণ করিল। ইহাতে কর্ণাটের নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগকে দুরীকৃত করিবার অভিপ্রায়ে দশ সহস্র সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজে আসিলেন। কিন্তু সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, তিনি ফরাসীদিগের মুষ্টিমেয় সৈন্যের নিকট পরাজিত হইলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে আবার কয়েক খানি জাহাজ আসিল এবং ইংরাজ সৈন্য পঁদিচেরী অবরোধ করিল, কিন্তু ফরাসী সৈন্য ইংরাজদিগের সমুদয় চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া দিল। যাহা হউক, এই সময়ে ইউরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ের পরস্পর সন্ধি হইল। এই সন্ধি দ্বারা ইংরাজ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যাঁহার যেখানে অধিকার ছিল, সমুদয় পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং মান্দ্রাজ পুনর্ব্বার ইংরাজের হস্তগত হইল। কিন্তু মোটের উপর এই যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ।—যে বৎসর প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ শেষ হয় সে বৎসর (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) ভারতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসর দিল্লীর বাদসাহ মোহম্মদ সাহ, শিবাজীর পৌত্র সাহু, এবং নিজাম-উল-মুল্‌ক—এই তিন জন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নিজাম-উল্-মুল্‌কের মৃত্যুর পর নিজামরাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাসির-জঙ্গ ও প্রিয় দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। এদিকে কর্ণাটের নবাবী লইয়া পূর্ব্বতন নবাব দোস্ত আলির জামাতা চাঁদ সাহেব বর্ত্তমান নবাব আনোয়ারউদ্দিনের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ডুপ্লে এই দুই বিবাদের সাহায্যে ফরাসী প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে নবাব আনোয়ার-উদ্দিনের বহুসংখ্যক সৈন্য পরাস্ত করিয়া ডুপ্লের সাহস যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি এক্ষণে আনোয়ারউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী চাঁদ সাহেবকে আর্কটের নবাবী দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং মজঃফরজঙ্গকে নিজামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভরসা দিয়া নিজপক্ষে আনয়ন করিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মজঃফরজঙ্গ ও চাঁদ সাহেবের সৈন্য এবং নিজ ফরাসী সৈন্য সমবেত করিয়া আনোয়ারউদ্দিনের বিরুদ্ধে কর্ণাটে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুদ্ধে বৃদ্ধ নবাব আনোয়ারউদ্দিন নিহত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্র মোহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লীতে পলায়ন করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া নিজামের দ্বিতীয় পুত্র উল্লিখিত নাসিরজঙ্গ নিজপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে ইংরাজদিগকে আহ্বান করিলেন। ইংরাজেরা এতদিন নির্লিপ্ত ভাবে ছিলেন। তাঁহারা এখন ফরাসীদের প্রাধান্য বিস্তার দেখিয়া ভয় পাইলেন ও উহাদিগের বিরুদ্ধে নাসিরজঙ্গ ও মোহম্মদ আলির সহিত যোগ দিলেন। এই প্রকারে ইংরাজ ফরাসীর পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল।

প্রথমে আর্কটে ফরাসীপক্ষীয়দিগের জয় হইলেও মজঃফরজঙ্গ নাসির-জঙ্গের নিকট পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু ডুপ্লের চক্রান্তে নাসির নিহত হইলেন ও মজঃফর নিজামী প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে হায়দরাবাদ ও আর্কট উভয় সিংহাসনেই ফরাসীদের মনোনীত ব্যক্তি উপবিষ্ট হইলেন। কিছুদিন পরে মজঃফর গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেও ফরাসী সেনাপতি বুসী তৎক্ষণাৎ নিজামের তৃতীয় পুত্র সলাবত জঙ্গকে নিজামের পদে অভিষক্ত করিয়া ফরাসীদের প্রাধান্য বজায় রাখিলেন। ডুপ্লে কৃষ্ণানদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। বোধ হইল যেন ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। ইংরাজগণের ঘোর সঙ্কট কাল উপস্থিত হইল।

ক্লাইব।—কিন্তু ঠিক এই সময়ে এক ক্ষণজন্মা ইংরাজ যুবকের অপূর্ব্ব সাহস, বীর্য্য ও বুদ্ধি-কৌশলে ইংরাজদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন এবং পরিশেষে ফরাসীদের সকল আশা নির্ম্মূল হইল। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবকের নাম রবার্ট ক্লাইব। ইনি ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী হইয়া এদেশে আসেন। কিন্তু কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ কালেই তিনি লেখনী ছাড়িয়া তরবারি ধরিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে সাহস ও বিক্রমের যথেষ্ট পরিচয়

লর্ড ক্লাইব।

দিয়াছিলেন। কিন্তু আর্কট অবরোধ কালেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্কট অবরোধ।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবাব আনোয়ারউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ

করেন। চাঁদ সাহেব তাঁহাকে ধরিবার জন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিতে গেলেন। ক্লাইব দেখিলেন যে, চাঁদ সাহেব তাঁহার প্রায় সমস্ত সৈন্য লইয়া ত্রিচিনপল্লীতে গিয়াছেন, ফলে তাঁহার রাজধানী আর্কট সহর অরক্ষিত অবস্থায় আছে। তিনি এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিনা যুদ্ধে আর্কট অধিকার করিলেন (১৭৫১)। চাঁদসাহেব আর্কট পুনরধিকার করিবার জন্য তাঁহার পুত্রকে ১০,০০০ সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন। এই সঙ্গে ২৫০ জন সুশিক্ষিত ফরাসী সৈন্যও ছিল। কিন্তু ক্লাইব ১২০ জন ইংরাজ ও ২০০ জন মাত্র দেশীয় সৈন্যের সাহায্যে ৩২ দিন পর্য্যন্ত এরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলের সহিত আর্কট দুর্গ রক্ষা করিলেন যে, এই একমাত্র বীর কার্য্য দ্বারা ক্লাইবের সুখ্যাতি ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইল। আর্কট রক্ষার পর ইংরাজেরা চাঁদসাহেবের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। চাঁদ বন্দী হইলেন ও মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে নিহত হইলেন। ইংরাজগণ মান্দ্রাজ উপকূলে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন, এবং মোহম্মদ আলি আর্কটের সিংহাসনে সংস্থাপিত হইলেন।

ডুপ্লের পরিণাম।—অতঃপর ফরাসীরাজের বুদ্ধির দোষে ও শত্রুর চক্রান্তে ডুপ্লে এদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বৃথা বিবাদ বাধাইয়া ফরাসী কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন, এই অপরাধে পদচ্যুত হইলেন; ফরাসীজাতির প্রাধান্য বৃদ্ধির চেষ্টায় তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং নিজে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ ফরাসীরা একবারও তাঁহার মহদুদ্দেশ্যের কথা ভাবিল না, তাঁহাকে এরূপে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিল। ফলে ডুপ্লের এদেশ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা একরূপ লোপ হইল।

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ।—ডুপ্লে এদেশ হইতে চলিয়া গেলে, তাঁহার পরে যিনি শাসনকর্ত্তা হইলেন তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন

এবং বিবাদের ভয়ে ইচ্ছা করিয়া অনেক স্থান ছাড়িয়া দিলেন। এখন কেবল নিজামরাজ্যে ফরাসীদের প্রাধান্য রহিল। কিন্তু ইহাও অধিকদিন থাকিল না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুতরাং ভারতেও উভয় পক্ষ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ জয় হইল। তাঁহারা বাঙ্গালায় চন্দননগর অধিকার করিলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী গবর্ণর লালীর দোষে ফরাসীরা পরাজিত হইলেন। তিনি দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ নিজামের রাজ্য হইতে সেনাপতি বুসী ও তাঁহার সৈন্যগণকে নিজের সাহায্যার্থ লইয়া আসিলেন। ফলে হায়দরাবাদেও ফরাসী প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিবাস যুদ্ধে লালী ইংরাজ সেনাপতি সার আয়ার কূট কর্ত্তৃক পরাস্ত হইলেন। পরাজয়ের পর তিনি পঁদিচেরীতে আশ্রয় লইলেন ও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিয়া অবশেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে ভারতের সমস্ত ফরাসী অধিকৃত স্থান ইংরাজের হস্তে আসিল। ইহার কিছুদিন পরে ফরাসীরা সন্ধিবলে তাঁহাদের দুর্গ ও কুঠীগুলি ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আর মাথা তুলিতে পারিলেন না।

নবম অধ্যায়।

—:o:—

বাঙ্গালায় ইংরাজ অধিকারের সূত্রপাত।

সিরাজউদ্দৌলা।—১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার দৌহিত্র মির্জ্জা মোহম্মদ "সিরাজউদ্দৌলা" উপাধিগ্রহণ পূর্ব্বক বাঙ্গালার নবাবী সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তখন তাঁহার বয়স মোটে ১৮

বৎসর। তাহার উপর মাতামহের অত্যধিক আদরে তাঁহার সুশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার হিতাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা বড় একটা ছিল না। নবাবীগ্রহণ করিয়াই তিনি ইংরাজদের সহিত বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবাবের কলিকাতা জয়।—আলিবর্দ্দীর আমলে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার নায়েব নাজিমের সহকারীর কার্য্য করিতেন। সেই সময়ে

সিরাজউদ্দৌলা।

তিনি নানা উপায়ে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সে অর্থের উপর সিরাজউদ্দৌলার লোভ পড়ে। রাজা রাজবল্লভ বেগতিক দেখিয়া তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তির সহিত ইংরাজের আশ্রয় লইবার জন্য গোপনে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। সিরাজ নবাব হইয়াই কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি অবিলম্বে কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু ড্রেক সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। আবার এই সময়েই ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায়

ইংরাজগণ নবাবের অনুমতি না লইয়া কলিকাতার দুর্গের জীর্ণসংস্কার করিতেছিলেন। নবাব এই কার্য্য অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, ড্রেক সাহেব বলিলেন যে, কেল্লার সংস্কার হইতেছে মাত্র, নূতন কিছুই হইতেছে না। এই উত্তরে সিরাজউদ্দৌলা ক্রোধে অধীর হইয়া প্রথমে ইংরাজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠী গ্রহণ করিলেন, এবং তথাকার কর্ম্মচারীদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন। পরে ৫০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া কেল্লা অবরোধ করিলেন। নগরী ও কেল্লা নবাবের হস্তগত হইল। গবর্ণর ড্রেক প্রভৃতি অনেকে জাহাজে পলায়ন করিলেন। অবশিষ্ট ইংরাজেরা নবাবের হস্তে বন্দী হইলেন (২০শে জুন, ১৭৫৬)।

অন্ধকূপ হত্যা।—অতঃপর নবাব ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে তাঁহার সেনাপতির জিম্মায় রাখিয়া স্বয়ং রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলেন। এই ব্যক্তি সেই বন্দিগণকে ১২ হাত লম্বা ও ১২ হাত চওড়া একটী সামান্য গৃহে রাত্রিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই গৃহে ইংরাজগণ কয়েদী সেনাদিগকে রাখিতেন। ইহাতে দুইটী মাত্র সামান্য গবাক্ষ ছিল। সে সময়ে ভয়ানক গ্রীষ্ম; জল ও বায়ুর অভাবে বন্দিগণের ঘোর যন্ত্রণা হইতে লাগিল। মুক্তিলাভ করিবার জন্য তাঁহারা প্রহরীদিগের নিকট অনেক অনুনয় করিলেন। কিন্তু তৎকালে নবাব নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া কোন ফল হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু হইল। অবশিষ্ট ২৩ জন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। প্রাতঃকালে নবাব ইঁহাদিগকে কারামুক্ত করিলেন। খ্যাতনামা হল্‌ওয়েল সাহেব এই কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার জীবনরক্ষা হইয়াছিল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাসে "অন্ধকূপহত্যা" নামে খ্যাত হইয়াছে।

কলিকাতা উদ্ধার।—শীঘ্রই এই শোচনীয় সংবাদ মান্দ্রাজে পৌঁছিল। এই সময়ে ক্লাইব মান্দ্রাজের সন্নিকটে সেণ্টডেভিড দুর্গের

অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং এডমিরাল ওয়াট্সন ইংলণ্ডরাজের কতকগুলি রণতরি লইয়া মান্দ্রাজে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর তাঁহাদিগকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য বাঙ্গালায় প্রেরণ করিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্লাইব ও ওয়াট্সন, ৯০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ১৫০০ সিপাহীর সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া নবাবের সেনাপতি পলায়ন করিলেন এবং ইংরাজেরা পুনরায় কলিকাতা অধিকার করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া নবাব আবার সদলে কলিকাতায় আসিলেন, কিন্তু ক্লাইব সহসা তাঁহার শিবির আক্রমণ করিলে তিনি ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব সম্মত হইলেন এবং ইংরাজগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন (ফেব্রুয়ারি ১৭৫৭)।

পলাশীর যুদ্ধ।—কিন্তু এই সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হইল না। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে তোমরা পড়িয়াছ যে, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পরেই সিরাজ ইংরাজদের উচ্ছেদ কামনায় তাঁহাদের শত্রু ফরাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ক্লাইব ফরাসীদের অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন এবং কি করিয়া অব্যবস্থিতচিত্ত নবাবকে শিক্ষা দিবেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সিরাজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সেনাপতি মীরজাফর, সুবিখ্যাত ধনী মহতাব রায় জগৎশেঠ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। ইংরাজের সহায়তা ভিন্ন তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না বুঝিয়া, তাঁহারা ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইব এ সুযোগ ত্যাগ করিলেন না, তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। স্থির হইল, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে বসান হইবে। অতঃপর ক্লাইব ৩২০০

সৈন্য ও নয়টী মাত্র কামান লইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নবাব ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ১৮,০০০ অশ্বারোহী ও ৫৩টী কামান লইয়া ক্লাইবের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পলাশীর সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে পরস্পর সাক্ষাৎকার হইল। ক্লাইব নবাবের প্রভূত সেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি না মীমাংসা করিবার জন্য এক সামরিক সভা আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ হইতে বিরত থাকাই সভার পরামর্শ হইল। ক্লাইব প্রথমে সভার মতে মত দিলেন। কিন্তু অবশেষে সাত পাঁচ ভাবিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের সাক্ষাৎ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরজাফর সসৈন্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা যে পক্ষের জয় হইবে সেই পক্ষে যোগদান করিবেন। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর বেলা দ্বিপ্রহরের সময় নবাবের সেনাপতি মীরমদন গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। তখন নবাব ভীত হইয়া মীরজাফরকে পরামর্শের জন্য ডাকাইলেন এবং কাতরকণ্ঠে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। মিরজাফর যুদ্ধ স্থগিত

রাখিবার পরামর্শ দিলেন ও তদনুসারে নবাব তাঁহার সৈন্যদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। অকস্মাৎ যুদ্ধ থামিবার আদেশে সৈন্যগণ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল এবং ইংরাজেরা জয়ী হইলেন। নবাব প্রাণভয়ে উষ্ট্রারোহণে রাজধানী ছাড়িয়া পলাইলেন। কিন্তু পথে বন্দীকৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন এবং মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে

নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন। পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের ২৩ জন মাত্র সৈন্য হত, এবং ৪৯ জন আহত হইয়াছিল। কিন্তু এই সামান্য যুদ্ধের ফলেই

প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এইজন্যই ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

মীরজাফর।—পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ক্লাইব মীরজাফরকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী বা সুবাদারী পদে অভিষিক্ত করিলেন।

মীরজাফর।

মীরজাফর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, ইংরাজ কোম্পানি ক্ষতিপূরণার্থ তাঁহার নিকট অনেক টাকা দাবি করিলেন। কিন্তু তহবিলে তত টাকা ছিল না। এই জন্য ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর কোম্পানিকে ২৪ পরগণা জেলার জমিদারী প্রদান করিলেন।

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার ইংরাজ অধ্যক্ষ বাঙ্গালার গবর্ণর নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন এবং ক্লাইব বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অল্পদিন পরে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ক্লাইব ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন ও বঙ্গবিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ "লর্ড ক্লাইব" উপাধি পাইলেন।

মীরকাশিম।—মীরজাফর রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম ছিলেন; বিশেষতঃ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হওয়াতে তিনি শোকে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। রাজ্যে নানারূপ অশান্তি দেখা দিল। তাঁহার প্রধান সহায় ক্লাইব তখন উপস্থিত ছিলেন না। বান্সিটার্ট সাহেব তখন বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়াছিলেন। তিনি মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাবী প্রদান করিলেন (১৭৬১)। নবাব হইবার পরেই মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটী জেলার রাজস্ব প্রদান করিলেন।

মীরকাশিম বুদ্ধিমান, কর্ম্মক্ষম ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি নামে

মাত্র নবাব হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দেখিলেন, প্রকৃত নবাব হইতে হইলে তাঁহাকে ইংরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুঙ্গের নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিলেন, এবং ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে স্বীয় সেনাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। তোমরা জান, সম্রাট আওরঙ্গজেব বাৎসরিক তিন হাজার টাকা লইয়া কোম্পানিকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এই তিন হাজার টাকা ভিন্ন কোম্পানিকে অন্য শুল্ক দিতে হইত না। অবশ্য এ অধিকার কেবল কোম্পানিকেই দেওয়া হইয়াছিল, ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির কোন কর্ম্মচারীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর, কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ হিসাবে যে বাণিজ্য করিতেন, তাহার জন্যও মাশুল দেওয়া রহিত করিলেন। অথচ এতদ্দেশীয়দিগকে উক্ত শুল্ক পূর্ণমাত্রায় দিতে হইত। মীরকাশিম ইহাতে রোষপরবশ হইয়া এই শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে ফল হইল এই যে, কোম্পানি বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে যে অধিকারটুকু ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার আর মূল্য রহিল না। কোম্পানির কলিকাতাস্থিত কাউন্সিল নবাবের এই কার্য্যে অধিকার নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু নবাব সেই কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফলে বিবাদ উপস্থিত হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ কোম্পানির একখানি মাল বোঝাই নৌকা পাটনায় যাইতেছিল। নৌকা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে, মিরকাশিম তাহা আবদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পাটনার কুঠীর প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী এলিস সাহেব পাটনা অধিকার করিলেন, কিন্তু পরে নবাব সৈন্য পাটনা পুনরধিকার করিয়া তথাকার ইংরাজদিগকে বন্দী করিয়া রাখিল।

বাঙ্গালায় আবার সমরানল প্রজ্বলিত হইল। কাটোয়া, গিরিয়া ও

উধুয়ানালায় ইংরাজ সেনানী আডাম্‌স্‌ কর্ত্তৃক মীরকাশিমের সেনাপতিগণ পরাজিত হইলেন এবং অবশেষে মীরকাশিম পলায়ন পূর্ব্বক অযোধ্যার নবাব উজীর সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে পাটনার ইংরাজ বন্দীদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়া গেলেন। এই সময়ে সা-আলম দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজের হস্ত হইতে বাঙ্গালা উদ্ধার করিবার আশায় মীরকাশিম ও অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত হইয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বক্‌সারে ইংরাজ সেনাপতি মেজর মনরো মুসলমানদিগের সমবেত সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন [১৭৬৪]। বক্‌সারের যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সমগ্র অযোধ্যা ইংরাজের পদানত হইল, এবং সম্রাট্‌ সা-আলম বিপন্ন হইয়া স্বয়ং ইংরাজের শিবিরে উপনীত হইলেন। মীরকাশিম পরাজিত হইলে কোম্পানি মীরজাফরকে পুনর্ব্বার নবাবী প্রদান করিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের লোকান্তর হইল, এবং তাঁহার পুত্র নজম উদ্দৌলা নবাবী প্রাপ্ত হইলেন। বক্‌সারের যুদ্ধের পর অযোধ্যার নবাব কর্ত্তৃক হতভাগ্য মীরকাশিমের সর্ব্বস্ব অপহৃত হয় ও অবশেষে তিনি নিতান্ত দীনদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দশম অধ্যায়।

-:o:-

লর্ড ক্লাইব ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালী।

ক্লাইবের প্রত্যাগমন।—নবাবের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্লাইবকে পুনরায় বাঙ্গালার গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন,

যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে। নজমউদ্দৌলা নবাব হইয়া বসিয়াছেন। ভবিষ্যতে যাহাতে আর অশান্তি না হয়, তিনি তখন তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ।—তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াই এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় সা-আলম ও অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি সূত্রে অযোধ্যার নবাব অযোধ্যা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং কড়া ও এলাহাবাদ প্রদেশদ্বয় ইংরাজদিগকে সমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা কড়া ও এলাহাবাদ সম্রাট্ সা-আলমকে দিলেন ও সম্রাট্ তৎপরিবর্ত্তে কোম্পানিকে বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায় করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। এই সঙ্গে মাদ্রাজের অন্তর্গত উত্তর সরকার
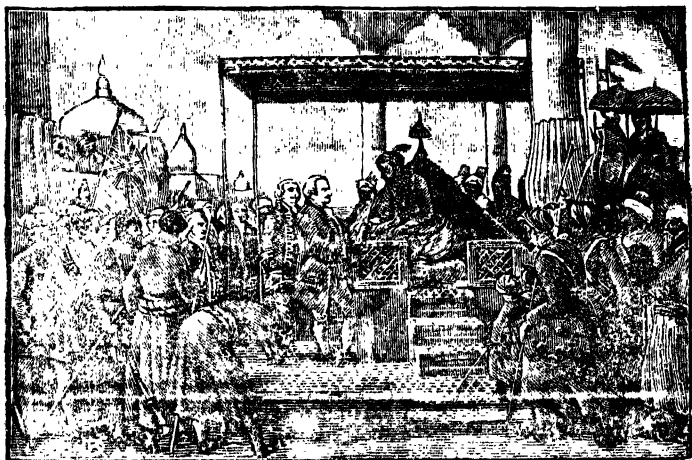
ইংরাজের দেওয়ানী প্রাপ্তি।

প্রদেশও কোম্পানির হস্তগত হইল। বাঙ্গালার দেওয়ানী সম্বন্ধে এই নিয়ম হইল যে, কোম্পানি সমগ্র রাজস্ব হইতে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা

দিল্লীর সম্রাট্‌কে তাঁহার মালিকানা স্বরূপ প্রদান করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে নবাবের সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, রাজকার্য্যের ব্যয়ের জন্য তিনি বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। অবশিষ্ট রাজস্ব ইংরাজগণই পাইবেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানি এই দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতেই ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রকৃত অধীশ্বর হইলেন বলিতে হইবে, কারণ এই সময় হইতে নবাবের প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ক্ষমতাই রহিল না। তিনি ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইলেন। কোম্পানি শুধু দেওয়ানী নয়, সেনা রক্ষার ক্ষমতাও নিজ হস্তে লইলেন। সুতরাং দেশের অর্থবল ও সৈন্যবল উভয় বলেরই তাঁহারা অধিকারী হইলেন। নবাব মাত্র বিচার ও পুলিশের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

ক্লাইব কর্ত্তৃক কোম্পানির কর্ম্মচারীদের সংশোধন।—ক্লাইবের অনুপস্থিতিকালে কোম্পানির কাজ কর্ম্মের বড়ই গোলযোগ হয়। কোম্পানির কর্মচারীদিগের অতি অল্পমাত্র বেতন ছিল। সুতরাং তাহারা সকলেই উৎকোচ গ্রহণ ও নিজের হিসাবে কারবার করিয়া আপন আপন আয়বৃদ্ধি করিতে ত্রুটি করিত না। ক্লাইব এই নিয়ম করিলেন যে, অতঃপর কেহই এতদ্দেশীয়দিগের নিকট উপহার গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং কেহই নিজের স্বার্থের জন্য কারবারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।

দুই রাজার শাসনফলে বাঙ্গালার দুর্দ্দশা।—১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব পীড়িত হইয়া স্বদেশযাত্রা করেন ও তাঁহার পর বর্লেষ্ট ও কার্টিয়ার এই দুই জন পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত হন। ক্লাইব চলিয়া যাইবার পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালীর অনেক দোষ দেখা গেল। তাঁহার ব্যবস্থা অনুসারে মুর্শিদাবাদের নবাব বিচার কার্য্যের ও শান্তিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং কোম্পানি রাজস্ব আদায় ও দেশরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশে দুইজন রাজা হওয়াতে শাসনকার্য্যের বড়ই অসুবিধা ঘটিতে লাগিল।

এই অবস্থায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ দেখিতে লাগিলেন। নবাব দেখিলেন যে, তাঁহার হস্তে প্রকৃত ক্ষমতা কিছুই নাই। ইংরাজেরাই প্রকৃত রাজা। দেশশাসন ও বিচারকার্য্য করিয়া তাঁহার বিশেষ কোন লাভ নাই। তিনি প্রজাপালন করুন বা নাই করুন, তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ভিন্ন আপন বিবেচনামত প্রজাপালন করিতে গেলে হয়ত তাঁহার সহিত কোম্পানির সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এইরূপ ভাবিয়া তিনি প্রজাপালনে আর অধিক যত্ন করিলেন না।

এদিকে কোম্পানিও ভাবিলেন, যে তাঁহাদের স্বার্থ রাজস্ব সংগ্রহ করা ও বঙ্গদেশকে বিদেশীয় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করা। প্রজার সুখ দুঃখ তাঁহাদের দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই ভাবে ৭ বৎসরকাল বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য চলিল। নানা কারণে দেশের অবস্থা ক্রমে খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। নজম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর কয়েকজন নাবালক নবাব সিংহাসনে বসিলেন। ফলে রাজকার্য্যের আরও বিশৃঙ্খলতা ঘটিল।

ইহার উপর আবার কোম্পানিও অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায়ের দিকে মন দিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত ভার দেশীয় হস্তে রহিল এবং মহম্মদ রেজা খাঁ নবাব ও দেওয়ান উভয়েরই নায়েবের পদে নিযুক্ত হইয়া নবাবের কার্য্য ও ইংরাজদিগের কার্য্য উভয় কার্য্যই দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের স্বার্থের দিকে চাহিয়া স্থির করিলেন যে ইংরাজেরাই প্রকৃত রাজা, অতএব তাঁহাদের তুষ্টিসাধন আবশ্যক। অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিয়া দিতে পারিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিবেন, এইরূপ ভাবিয়া ইনি ক্রমে ক্রমে প্রজাদিগের উপর গুরু করভার চাপাইলেন। ফলে তাহারা নিঃস্ব হইয়া পড়িল এবং অনেকে বাধ্য হইয়া কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিল। দেশে দস্যু তস্করের উৎপাত বাড়িতে লাগিল। ইহার উপর আবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল।

ফলে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ঐ দুর্ভিক্ষ হেতু বঙ্গদেশে অধিকাংশ লোকেই অনাহারে কাল কাটাইতে লাগিল। ক্রমে অন্নাভাবে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার রোগ দেখা দিল। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাকেই লোকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে।

হায়দার আলি ও প্রথম মহীশূর যুদ্ধ।—বাঙ্গালায় যখন এই অবস্থা দাক্ষিণাত্যেও তখন ইংরাজের এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে টালিকোটার যুদ্ধে প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংস হয়—

হায়দর আলি।

ইহা তোমাদের মনে আছে। বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংস হইলে উহার ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

গুলির মধ্যে মহীশূর রাজ্যটী অনেক দিন পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদিগের শাসনাধীন ছিল। শ্রীরঙ্গপত্তন নগরে এই নূতন হিন্দুরাজ্যের রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৩৪ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কৃষ্ণরায় মহীশূরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অলস ও অকর্ম্মণ্য ছিলেন বলিয়া তাঁহার মন্ত্রী নন্দরাজই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই নন্দরাজের অধীনে হায়দার আলি নামে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিলেন। হায়দার আলি বিশেষ কর্ম্মদক্ষ ছিলেন বলিয়া ক্রমশঃ তাঁহার পদবৃদ্ধি হইতে থাকে। অবশেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া মহীশূরের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন ও চতুর্দ্দিকে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ বাধিল। সে সময়ে ইংরাজদের লোক ও অর্থ দুইয়েরই অভাব ছিল। সুতরাং দুই এক স্থানে হায়দার পরাজিত হইলেও তিনি ইচ্ছামত কর্ণাট অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ সসৈন্যে মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। স্থির হইল, উভয় পক্ষ যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, প্রত্যেকে অপরকে তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং কোন পক্ষের বিপদ উপস্থিত হইলে অপর পক্ষ সৈন্যাদি দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবেন; ইংরাজদের সহিত হায়দার আলির এই যুদ্ধ প্রথম মহীশূর যুদ্ধ নামে খ্যাত।

একাদশ অধ্যায়

—:o:—

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্—বাঙ্গালার গবর্ণর, ১৭৭২—১৭৭৪।

—ক্লাইব চলিয়া যাইবার পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর ফলে বাঙ্গালার যে দুরবস্থা হইল তাহাতে কোম্পানি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তাঁহাদের দেড় কোটি টাকার উপর ঋণ হইয়া পড়িল। তাঁহারা বুঝিলেন, এসময় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর বাঙ্গালার শাসন-

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্।

ভার না দিলে তাঁহাদের মঙ্গল নাই। সেইজন্য তাঁহারা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসকে বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংসের ন্যায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী তখন অল্পই ছিল। তিনি ইতঃপূর্ব্বে এদেশে কোম্পানির অধীনে বহুকাল কর্ম্ম করিয়া এদেশের ভাষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার

শাসনভার গ্রহণ করিয়াই রাজ্যের আয় ব্যয় সংস্কার ও শৃঙ্খলা সম্পাদনে মনোনিবেশ করিলেন।

শাসনপ্রণালীর সংস্কার।—ক্লাইব প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালী সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া প্রথমেই তিনি তাহার পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, দেশের শাসনকার্য্য এরূপভাবে নবাবের সহিত ভাগ করিয়া লইলে চলিবে না। দেশ সুশাসিত করিতে হইলে ইংরাজকেই সকল ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

সে সময়ে নায়েব-দেওয়ানরূপে মোহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গালায় ও রাজা সিতাব রায় বিহারের রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রজাদিগের উপর নানা অত্যাচার করিতেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া রাজস্ব আফিসগুলি কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন ও তদুপরি রেভিনিউ বোর্ড সংস্থাপন করিলেন, এবং বঙ্গ ও বিহারকে ১৮টি জেলায় বিভক্ত করিয়া জেলায় জেলায় কালেক্টার নিযুক্ত করতঃ বর্ত্তমান প্রণালীতে রাজস্ব আদায়ের সূত্রপাত করিলেন। প্রতি জেলায় একটী করিয়া দেওয়ানী ও একটী করিয়া ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল ও কালেক্টরের হস্তে বিচার ভার দেওয়া হইল। মোকদ্দমার আপীলের জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামক দুইটী উচ্চ আদালত স্থাপিত হইল; প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদাবাদের পরিবর্ত্তে কলিকাতাই এক্ষণে রাজধানী হইল।

জমিদারগণের সহিত তিনি নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। পূর্ব্ব জমিদারগণের মধ্যে যাঁহারা নির্দ্ধারিত কর দিতে চাহিলেন, তাঁহাদের জমিদারী বজায় রহিল। যাঁহারা সম্মত হইলেন না, তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়া অপরের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করা হইল।

আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাস।—সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস্ খরচ কমাইয়া কোম্পানির অর্থাগমের দিকে মন দিলেন।

প্রথমতঃ তিনি নবাবের বৃত্তি অনেক কমাইয়া দিলেন। কারণস্বরূপ বলিলেন যে, এখন নবাবের হস্ত হইতে শাসন ও বিচারাদি সমস্ত কার্য্যই কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং অত টাকা বৃত্তি তিনি পাইতে পারেন না।

অতঃপর তিনি দেখিলেন যে, সম্রাট্ সা-আলমকে বৃত্তি দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। সা-আলম তৎকালে মরাঠাদিগের হস্তে ক্রীড়নক প্রায় হইয়া তাঁহাদেরই অধীনে বাস করিতেছিলেন এবং এলাহাবাদ ও কড়াপ্রদেশ তাঁহাদিগকে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস্ দেখিলেন এলাহাবাদ ও কড়া মরাঠাদিগের হাতে পড়িলে তাহারা বাঙ্গালার সীমান্তে আসিয়া পড়িবে। এতদ্ভিন্ন সম্রাটের বৃত্তি এখন মরাঠাদিগের হস্তেই যাইতেছে, উহাতে ইংরাজদের কোন উপকার না হইয়া বরং তাঁহাদের প্রবল শত্রুর বলবৃদ্ধি হইতেছে। এইরূপ ভাবিয়া হেষ্টিংস ৫০ লক্ষ টাকা মূল্য লইয়া এলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় করিলেন এবং সম্রাটের বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানির ব্যয় বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কমিয়া গেল, তাঁহারা নগদ ৫০ লক্ষ টাকা পাইলেন এবং অযোধ্যার নবাবের রাজ্য ও বলবৃদ্ধি হওয়ায় বঙ্গদেশে মরাঠা আক্রমণের ভয় নিবারিত হইল।

অযোধ্যা প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত রোহিলখণ্ড দেশটাকে নিজের অধিকারভুক্ত করিবার জন্য অযোধ্যার নবাব অনেকদিন অবধি চেষ্টান্বিত ছিলেন। কিন্তু রোহিলারা বিলক্ষণ সাহসী, সবলশরীর ও যুদ্ধ-নিপুণ ছিল। সুতরাং নবাব একাকী উহাদিগের সহিত শত্রুতা করিতে সাহসী না হইয়া হেষ্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হেষ্টিংস্ রোহিলখণ্ড জয় হইলে মিত্র-রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কিছু অর্থাগম হইবে বুঝিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া

দিলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড নবাবের হস্তগত হইল। নবাব কোম্পানিকে সাহায্যের মূল্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাকা দিলেন।

রেগুলেটিং এক্ট।—যে সময়ে হেষ্টিংস্ গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া এখানে আসেন, সে সময় কোম্পানির রাজকার্য্যের বিশৃঙ্খলতার বিষয় ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হয় ও পার্লামেণ্ট মহাসভায় এ সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। ফলে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, কোম্পানির শাসনপ্রণালীর সংশোধন আবশ্যক এবং তদুদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা রেগুলেটিং এক্ট (বা শাসন সংস্কার আইন) নামে এক আইন প্রস্তুত করিলেন। এতদ্বারা স্থির হইল যে, (১) অতঃপর বাঙ্গালার গবর্ণর "গবর্ণর-জেনারল" নামে অভিহিত হইবেন এবং তাঁহার কাউন্সিলে বা মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের অধীন হইবেন। (২) কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামে এক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহাতে কলিকাতার অধিবাসীদিগের এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের বিচার হইবে। ঐ বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন অধস্তন জজ থাকিবেন। তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এ বিষয়ে কোম্পানির কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (৩) কোম্পানির শাসন-সংক্রান্ত সকল ব্যাপার পার্লামেণ্টের গোচর করিতে হইবে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্; ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারল, ১৭৭৪।—১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী হইল এবং ইহার ফলে এদেশে নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল এবং উহাতে হেষ্টিংসের বন্ধু সার ইলাইজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। জেনারল ক্লেভারিং, কর্ণেল মন্‌সন্, সার ফিলিপ-ফ্রান্সিস্ ও বারওয়েল সাহেব এই চারিজন

গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হইলেন। উহাদিগের মধ্যে বারওয়েল সাহেব অনেক দিন ভারতে ছিলেন ও হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন। অপর তিনজন—সার ফিলিপ ফ্রান্সিস্, কর্ণেল মন্‌সন্ ও জেনারল ক্লেভারিং—এদেশে নূতন আসেন।

মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড।--হেষ্টিংসের কাউন্সিলের চারিজন সদস্যের মধ্যে কেবল বারওয়েলই গবর্ণর জেনারলের পক্ষপাতী ছিলেন। অপর তিনজন তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। গবর্ণর জেনারল আইন অনুসারে অধিকাংশ সদস্যের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে বাধ্য ছিলেন। ফলে হেষ্টিংসের সকল ব্যবস্থাই কাউন্সিল উল্টাইয়া দিতে লাগিলেন, হেষ্টিংসের আর কোন ক্ষমতা রহিল না। সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার শত্রুরা তাঁহার নামে নানা অভিযোগ আনিতে লাগিল। এই সকল অভিযোগকারীদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার প্রধান ছিলেন। নন্দকুমার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নবাব সরকারে ফৌজদারী, দেওয়ানী প্রভৃতি অনেক বড় বড় চাকরী করিয়াছিলেন, এবং বাদসাহ সা-আলমের নিকট মহারাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। নানাকারণে নন্দকুমার হেষ্টিংসের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। এখন তিনি হেষ্টিংসের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনিলেন। হেষ্টিংস সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন এবং চক্রান্ত করার জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করিলেন। ঐ মোকদ্দমা শেষ না হইতেই, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তিনি একখানি তমসুক জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পের নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইল। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হইলেন, এবং ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে জাল করার অপরাধে তাঁহার ফাঁসী হইল।

পর বৎসর মনসনের মৃত্যু হইল ও তাহার পর ক্লেভারিং পরলোক

গমন করিলেন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্ও হেষ্টিংসের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। সুতরাং হেষ্টিংস নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ছাড়িলেন না।

প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ।—হেষ্টিংসের সময়ে ভারতে ইংরাজদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন,—মরাঠাগণ ও মহীশূররাজ। হেষ্টিংসকে এই দুই শক্তির সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় পেশোয়া বালাজীরাও-য়ের কথা তোমরা জান। পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন ও তাঁহার পুত্র মাধবরাও পেশোয়া হন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে

নানা ফড়নবিশ।

মাধবরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর তিনি খুল্লতাত রঘুনাথরাওয়ের চক্রান্তে

নিহত হন এবং রঘুনাথ নিজেই সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। নারায়ণের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই রাজ্ঞী এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম হইল মাধবরাও নারায়ণ। রঘুনাথের ব্যবহারে হোলকার, সিন্ধিয়া প্রভৃতি সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানা ফড়নবিশ নামে এক বিচক্ষণ কর্ম্মচারী তাঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া নারায়ণ রাওয়ের নবজাত-শিশু মাধবরাও নারায়ণকে পেশোয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। রঘুনাথরাও উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজ কোম্পানির আশ্রয়গ্রহণ করিলেন ও সুরাট নগরে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া স্বীকার করিলেন যে, যদি তিনি ইংরাজের সাহায্যে পুণার সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী সাল্‌সেট্ ও বাসীন নামক স্থানদ্বয় ইংরাজদিগকে প্রদান করিবেন (১৭৭৫)। এই সন্ধি বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের সহিত হইয়াছিল, কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইহার অনুমোদন না করিয়া পুরন্দর নামক স্থানে নানা ফড়নবিসের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে মরাঠারা রঘুনাথকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি দিলে তিনি পেশোয়া পদের দাবী পরিত্যাগ করিবেন। ইহাতেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে ডিরেক্টরেরা (অর্থাৎ কোম্পানির অধ্যক্ষেরা) সুরাটের সন্ধি অনুসারে কার্য্য করিবার আদেশ দিলেন। ফলে ইংরাজের সহিত মরাঠাদের যুদ্ধ বাধিল। প্রথমে ইংরাজ পক্ষের বড় সুবিধা হইল না এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একদল ইংরাজ সৈন্য ওয়ার্গামে মরাঠাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু শীঘ্রই হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হইতে প্রেরিত সৈন্যের দ্বারা সে কলঙ্ক অপনোদিত হইল। মরাঠারা উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং ইংরাজেরা গুজরাট ও গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিলেন। অবশেষে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার চেষ্টায় সালবাই নগরে উভয়

পক্ষের মধ্যে সন্ধিবন্ধন হইল। এই সন্ধি দ্বারা মাধবরাও নারায়ণ প্রকৃত পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, রঘুনাথরাও বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রস্থান করিলেন, গুজরাট ও গোয়ালিয়র মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে প্রত্যর্পিত হইল, এবং ইংরাজগণ সালসেট্, বাসীন, ও এলিফাণ্টাদ্বীপ প্রাপ্ত হইলেন। এই যুদ্ধকে প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বলে।

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ।—যে সময় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে আবার মহীশূরের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্রথম মহীশূর যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দার আলির যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দার আলিকে তদীয় শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ইহার পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দার আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরকে সৈন্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে অসম্মত হন। এই জন্য হায়দর আলি পুনর্ব্বার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হন এবং যুদ্ধের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন; কিছুদিন পরে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসী-দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরাজেরা হায়দরের রাজ্যাভ্যন্তরস্থ ফরাসীদের অধিকৃত মাহী আক্রমণ করেন। হায়দর তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন, তাঁহারা শুনিলেন না, সুতরাং হায়দর ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৮০,০০০ সৈন্য সমবেত করিয়া কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করিলেন এবং পল্লিলুর নামক স্থানে একদল ইংরাজ সৈন্য বিনষ্ট করিলেন।

ইহার পর ইংরাজ সৈন্য তাঁহাকে বারবার পরাজিত করিল, তথাপি তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ফরাসী সেনাপতি বুসীর সাহায্যে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের সহিত ফরাসীদের সন্ধি হইল এবং বুসী টিপুর পক্ষ ত্যাগ

করিলেন। পরবৎসর মাঙ্গালোর নগরে টিপু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত এই সর্ত্তে সন্ধি করিলেন যে উভয় পক্ষই নিজ নিজ পূর্ব্ব অধিকার পুনঃ-প্রাপ্ত হইবেন। হায়দর আলির সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই যুদ্ধ দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ নামে খ্যাত।

চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি।—যুদ্ধের দরুণ অর্থের অনাটন হওয়াতে হেষ্টিংসকে আবার অর্থাগমের উপায় চিন্তা করিতে হইল। তৎকালে বারাণসীরাজ্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের করদরাজ্যে পরিণত হইয়া তাঁহাদের রক্ষণাধীন ছিল। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ইংরাজদিগকে বাৎসরিক ২২৷৷ লক্ষ টাকা কর দিতেন। চৈৎসিংহ বিলক্ষণ ধনশালী ছিলেন। হেষ্টিংস এই দুঃসময়ে চৈৎসিংহের নিকট অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা কর চাহিলেন। অবশ্য সঙ্কটকালে সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের প্রথা চিরকালই চলিত আছে। যাহা হউক, চৈৎসিংহ দুই বৎসর ঐ কর দিয়া পরে আপনার অভাব জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। হেষ্টিংস এই জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তিনি পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী হওয়ায় হেষ্টিংস তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারাণসী প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারাণসীরাজের দেয় কর বর্দ্ধিত করিয়া ৪০ লক্ষ টাকা করিলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে সমস্ত রাজোচিত ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন।

অযোধ্যার বেগম নিগ্রহ।—চৈৎসিংহের পদচ্যুতির কিছু দিন পরেই হেষ্টিংস আর এক উপায়ে কোম্পানির ধনাগার পূরণ করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা অঙ্গীকার করেন যে তিনি নিজরাজ্য রক্ষার জন্য একদল ইংরাজ সৈন্য অযোধ্যায় রাখিবেন ও উহার পোষণের ব্যয় বহন করিবেন। কিন্তু ঐ সৈন্য পোষণের ব্যয় যথা সময়ে ইংরাজদিগকে দিতে না পারায় তিনি কোম্পানির নিকট প্রায় দেড় কোটি টাকা ঋণী হন। এক্ষণে হেষ্টিংস ঐ টাকা চাহিলে, নবাব জানাইলেন যে

তাঁহার পিতার সঞ্চিত বহু অর্থ তাঁহার বিমাতা বেগমদিগের হস্তে আছে। ঐ অর্থ আদায় করিতে না পারিলে তিনি ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না। তৎকালে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ও নানা কারণে বেগমদিগের উপর হেষ্টিংসের বিরাগ উপস্থিত হওয়ায় হেষ্টিংস নবাবকে ঐ টাকা আদায়ের অনুমতি দিলেন। নবাব বেগমদিগকে বিশেষ পীড়ন করিয়া অনেক টাকা আদায় করিয়া লইলেন।

পিটের ইণ্ডিয়া এক্ট।—ভারতে এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ-অশান্তির কথা শুনিয়া ইংলণ্ডের অনেক লোকের মনে কোম্পানির রাজ্যশাসন-প্রণালীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মিল এবং তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে আবার একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। এই আইনটী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী উইলিয়ম পিট্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে "কোর্ট অব ডিরেক্টার্স্" বা কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সভা দ্বারাই কোম্পানির সকল কার্য্য পরিচালিত হইত। এক্ষণে এই ব্যবস্থা হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অতঃপর একটী ক্ষুদ্র কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবে। ডিরেক্টর সভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও একজন প্রধান সদস্য এই কমিটীর সদস্য নিযুক্ত হইবেন। এই কমিটীকে রাজার দ্বারা নিযুক্ত 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' নামক নূতন সভার তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। গবর্ণর জেনারল প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগের ভার এই আইন দ্বারা ডিরেক্টর সভার হস্তেই নিহিত রহিল বটে, কিন্তু স্থির হইল যে বোর্ডের অনুমোদন ভিন্ন তাঁহারা কাহাকেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। বোর্ড ইচ্ছা করিলে যে কোন কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন। এইরূপে ভারত-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বোর্ডের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল।

হেষ্টিংসের বিচার।—১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস কর্ম্ম হইতে

অবসর গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর বৎসর পার্লামেণ্ট মহাসভায় বার্ক, ফক্স প্রভৃতি বাগ্মিগণ তাঁহার নামে রোহিলাদেশ লুণ্ঠন, অযোধ্যার বেগমদিগের নিগ্রহ, নন্দকুমারের ফাঁসি, চৈৎসিংহের পদচ্যুতি প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাত বৎসর ধরিয়া লর্ডস্ সভার নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইল। কিন্তু অবশেষে বিচারকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্র।—এই সকল অভিযোগ সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই থাকুক, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে হেষ্টিংসের দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছিল। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে প্রজাপীড়ন হইত, হেষ্টিংস তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রযত্নে আধুনিক বিচারালয় ও পুলিশের মূলভিত্তি সংস্থাপিত হয়। তিনিই প্রথমে পণ্ডিতদিগের দ্বারা হিন্দু আইন সঙ্কলন করান। তিনি বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুবিখ্যাত সার উইলিয়ম্ জোন্স্ মনুসংহিতা শকুন্তলা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উপর ইউরোপীয়গণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার সুবিধার্থ হেষ্টিংস কলিকাতা মহানগরীতে প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা সংস্থাপন করেন। উহাই অধুনা সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাসা কলেজে পরিণত হইয়াছে। গবর্ণর জেনারল হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিনি যে সকল রাজনৈতিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে হেষ্টিংসকে একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, অধ্যবসায়শীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কার্য্যতৎপর, ও সাহসী শাসনকর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

হেষ্টিংসের সময় ইংরাজরাজ্যের পরিমাণ।—হেষ্টিংস্ যখন এদেশ ত্যাগ করেন, তখন উত্তর ভারতে বাঙ্গালা, বিহার, ও

বারাণসী প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে উত্তর সরকার প্রদেশ ও মান্দ্রাজ, দেবীকোট্টা, নাগাপত্তন, বোম্বাই, সালসেট, বাসীন, এলিফাণ্টা, সুরাট দুর্গ

প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অযোধ্যা ও আর্কট রাজ্য কোম্পানির আশ্রিত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

-:০:-

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও সার জন্ শোর্।

সার জন্ ম্যাক্ফারসন্।—ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। কর্ণওয়ালিসের নিয়োগ ও তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন এই উভয় ঘটনার মধ্যে ২০ মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ২০ মাস কাল অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারলের কাউন্সিলের প্রধান সদস্য সার জন্ ম্যাক্ফারসন্ ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।—লর্ড কর্ণওয়ালিসের পূর্ব্বে কোম্পানি আপন পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্য হইতেই শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, পূর্ব্বে কখন কোম্পানির অধীনে কার্য্য করেন নাই। কিন্তু তিনি নানাবিধ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ও স্বাধীন-চিত্ততার জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি এখানে কার্য্যভার লইবার পূর্ব্বে এই সর্ত্ত করিলেন যে, তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যগণ তাঁহার সহিত ভিন্নমত হইলেও তিনি আপন মতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন। সুতরাং ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মত তাঁহাকে সহযোগীদিগের প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হয় নাই।

শাসনপ্রণালী প্রভৃতির সংস্কার।—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শাসন-ভার গ্রহণপূর্ব্বক প্রথমে শাসনপ্রণালীর অনেক দোষ সংশোধন করিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্।

ক্লাইব ও হেষ্টিংস অনেক চেষ্টা করিয়াও কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দোষ সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে পারেন নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্ম্মচারীদিগের যোগ্যতানুরূপ বেতন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক এই কঠোর নিয়ম প্রচার করিলেন যে, অতঃপর কোন অন্যায় উপায়ে অর্থো-পার্জ্জন করিলে সকল কর্ম্মচারীই উপযুক্তরূপে দণ্ডিত হইবেন।

বিচারকার্য্য সম্বন্ধে তিনি অনেক উন্নতিসাধন করেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ব্যবস্থানুসারে প্রতি জেলায় কালেক্টরেরাই রাজস্ব আদায় ও বিচার উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ বিচারকার্য্যের ভার রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে লইয়া নূতন নিযুক্ত ইংরাজ জজদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা, ঢাকা, পাট্না ও মুর্শি-দাবাদ নগরে "প্রবিন্সিয়াল কোর্ট" নামে চারিটী উচ্চতর আদালত সংস্থাপন করিলেন। আদালতের কার্য্য-প্রণালী ইঁহার সময়েই প্রথম নির্দ্ধারিত হয়।

কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে পুলিশ সম্বন্ধে অনেকটা সুবন্দোবস্ত হয়। নানা স্থানে থানা সংস্থাপিত হয়, এবং প্রত্যেক থানায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হন। এই সকল পুলিশ কর্ম্মচারী তৎকালে জেলার জজের অধীনে কার্য্য করিতেন। কর্ণওয়ালিসের সময়ে অনেক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং সাধারণের সুবিধার জন্য প্রচলিত আইনগুলিকে বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষায় অনূদিত করা হয়।

বাঙ্গালার ভূমিঘটিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।—বাঙ্গালার ভূমিঘটিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে বাঙ্গালায় ভূমির রাজস্ব আদায় হইত। জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিতেন ও তজ্জন্য ভূমির রাজস্বের কিয়দংশ পারিশ্রমিক স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেন। কোন্ ভূমি হইতে প্রতি বৎসর কত রাজস্ব আদায় হইতে পারে, তাহার কোন নির্দ্ধারিত বন্দোবস্ত ছিল না। সুতরাং এক ভূমি হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন হারে খাজনা আদায় হইত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রথমে জমিদারদের সহিত পাঁচ বৎসরের ইজারা বন্দোবস্ত করিতেন, কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় পরে বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির রাজস্বের কিছুই স্থিরতা ছিল না, আর জমিদারেরাও জমিদারীর উন্নতির দিকে মন দিতেন না। এই সমস্ত অসুবিধা দেখিয়া সার ফিলিপ্ ফ্রান্সিস্ জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বহু বিচারের পর ডিরেক্টর্ সভা ফ্রান্সিসের মতেরই পোষকতা করিলেন, এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌কে জমিদারগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে দুই বৎসরের চেষ্টায় খাজনার হার-নির্দ্ধারণ

সমাপ্ত হইল। আকবরের সময়ে নিরিখ অর্থাৎ খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে জরিপ জমাবন্দি করা হইত, অধুনা ইংরাজ অধিকারেও তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু কর্ণওয়ালিস্ খাজনার হার নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে জমি জরিপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের গড় ধরিয়া ভবিষ্যতের হার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা দিবার নিয়ম ১০ বৎসরের জন্য প্রবর্ত্তিত হয়। এই জন্য ঐ বন্দোবস্তের নাম দশসালা বন্দোবস্ত। পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দশসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার আইন বিধিবদ্ধ হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে বাঙ্গালার ভূমিঘটিত রাজস্ব সর্ব্বসমেত প্রায় ৩ কোটি টাকা নির্দ্ধারিত হয়। অদ্যাপি বাঙ্গালাদেশ হইতে ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকা আদায় হইয়া থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হওয়াতে জমিদারগণ ভূমির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। ইঁহারা গবর্ণমেণ্টকে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া জমিদারীর সমস্ত আয় স্বয়ং ভোগ করিয়া থাকেন, জমিদারীর আয় বৃদ্ধি হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট অতিরিক্ত রাজস্বের দাবী করিতে পারেন না। এক সময়েই বাঙ্গালা, বিহার, বারাণসী ও উত্তর সরকার এই কয়টী প্রদেশে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়াতে জমিদারদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রজাদিগের বিশেষ সুবিধা হয় নাই। কারণ জমিদারগণ ইচ্ছা করিলেই খাজনাবৃদ্ধি করিতে পারিতেন। অধুনা প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের অনেকটা সুবিধা করিয়াছেন।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ।—দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ করা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ ছিল। কর্ণওয়ালিসও যুদ্ধ-বিগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মহীশূরের টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। হায়দরের পর টিপু রাজা হইয়া হিন্দু ও খ্রীষ্টান প্রজাদিগের উপর বিষম অত্যাচার করিতে আরম্ভ

করেন এবং অনেককে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌ প্রথমতঃ টিপুকে এই অন্যায় কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু টিপু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

টিপু।

কর্ণওয়ালিস্‌কে অগত্যা টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল। কর্ণ-ওয়ালিস্‌ স্বয়ং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়গণ টিপুর বিরুদ্ধে কর্ণওয়ালিসের সহায়তা করিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিল। তখন টিপু সন্ধিপ্রার্থনা করিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধিবন্ধন হইল। টিপু তদীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কর্ণওয়ালিস্‌ উহার কিয়দংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ও কিয়দংশ নিজামকে ভাগ

করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট টিপুর নিকট তিন কোটি টাকা পাইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ ৩০ লক্ষ টাকা পাইলেন। টিপুর দুইটী পুত্র সন্ধিপত্রের প্রতিভূস্বরূপে বন্দীকৃত হইলেন। টিপু পরাজিত হইবার পর প্রতিহিংসার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস্ পদত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করিলেন। বিলাত যাইবার পর টিপুর পরাজয়ের পুরস্কার স্বরূপ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ণওয়ালিস্‌কে মার্কুইস উপাধি প্রদান করিলেন। কর্ণওয়ালিসের পর সার জন্ শোর্ ভারতবর্ষের গবর্ণর্ জেনারল নিযুক্ত হইলেন।

সার জন্ শোর্।—সার জন্ শোর্ গবর্ণর্ জেনারল হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোম্পানির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার ভূমিবটিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংস্থাপন বিষয়ে সার জন্ শোর্ কর্ণওয়ালিসের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎকালে সার জন্ ভারতবর্ষ সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়েই বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

উদাসীন নীতি।—ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে উদাসীন নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি তাঁহাদের বিবাদ বিসংবাদ বা রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই উদাসীন রাজনীতির ফলে টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত মিত্ররাজ্যসমূহের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করেন। নিজাম মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে লাঞ্ছিত হন।

অযোধ্যার নূতন নবাব।—১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে উজীর আলি অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু উজীর আলি লোক ভাল ছিলেন না। এই জন্য সার জন্ শোর্ উজীর আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পূর্ব্ব নবাবের ভ্রাতা সাদৎ আলিকে অযোধ্যার নবাবীতে অভিষিক্ত করেন। সাদৎ আলি ইংরাজদিগকে এলাহাবাদ দুর্গ অর্পণ করেন।

সার্ জন্ শোর্ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করেন। তাঁহার সময়ে সিংহল প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজদিগের অধিকৃত প্রদেশসমূহ ইংরাজদের হস্তগত হয়। সেই জন্য তিনি 'লর্ড টেইনমাউথ্' উপাধি প্রাপ্ত হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:০:—

লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

সার্ জন শোরের পর লর্ড মর্নিংটন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন। ইনি 'মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্‌লি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই নামেই ইনি ইতিহাসে পরিচিত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে ওয়েলেস্‌লি কলিকাতায় উপস্থিত হন। তিনি যেমন সুপণ্ডিত, সুবক্তা ও সুরসিক ছিলেন, তেমনই উৎসাহশীল, পরিশ্রমী ও কার্য্যনিপুণ ছিলেন। ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিবার সময়ে তাঁহার ৩৭ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল, কিন্তু চারি বৎসর কাল বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের অন্যতম সদস্য থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে ফরাসীদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি ভারতবর্ষে আসিতে পারেন এরূপ আশঙ্কা হইতেছিল। ভারতবর্ষেও তখন হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাহায্যে ইংরাজকে ভারতভূমি হইতে বিদূরিত করিবার আশা করিতেছিলেন। নিজাম ও সিন্ধিয়ার রাজ্যেও অনেক ফরাসী সৈন্য ছিল।

ওয়েলেস্‌লির শাসননীতি।—ভারতের সমস্ত অবস্থা পর্য্যা-

লোচনা করিয়া ওয়েলেস্‌লি বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতীয় রাজগণের সম্বন্ধে আর উদাসীন নীতি অবলম্বন করিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহারা যতদিন স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন, ততদিন তাঁহারা বিবাদ বিসংবাদ পরস্বাপহরণ প্রভৃতি করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, ভারতেও শান্তি স্থাপিত হইবে না। বিশেষতঃ ভারতে আর কোন ইউরোপীয় শক্তি প্রবল থাকিলে তাঁহারা সুবিধামত তাহার সাহায্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে

লর্ড ওয়েলেস্‌লি।

বিপন্ন করিতে পারেন। সুতরাং ওয়েলেস্‌লি স্থির করিলেন যে, দেশীয় রাজগণকে সামন্তশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে হইবে। ভারতভূমিতে ইংরাজ জাতি সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন, ইংলণ্ডের রাজা ভারতের চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, ভারতবর্ষে ফরাসী বা অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির ক্ষমতা থাকিবে না, ইহাই হইল তাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে,

অতঃপর দেশীয় রাজগণকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি। কোন রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কাহারও সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পারিবেন না, এবং ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন বিদেশীয় লোককে নিজ সৈনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না। যদি রাজার রাজ্য বৃহৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ রাজ্যে ইংরাজ সেনানীর অধীনে একদল সৈন্য পোষণ করিতে হইবে; আর যদি রাজ্য ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কর দিতে হইবে। যে রাজা এই সকল নিয়মে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিবেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, তাঁহাকে বহিঃশত্রুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেন, এবং তাঁহার রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিবেন। দেশীয় রাজগণের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ "সাব্‌সিডিয়ারি এলায়েন্স্" বা সামন্ত সম্বন্ধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নিজামের সহিত সন্ধি।—যে সময় ওয়েলেস্‌লি দেশীয় রাজগণের সহিত এইরূপ "সামন্ত সম্বন্ধ" স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে সময় মোগল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভগ্নদশা, দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ সিন্ধিয়ার আশ্রিত। তখন শিখেরাও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে নাই, শিখবীর রণজিৎ সিংহ সবেমাত্র আফগানরাজের নিকট লাহোর শাসনের ভার পাইয়াছেন। সুতরাং উত্তর ভারতে সে সময় কোন প্রবল রাজা ছিলেন না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনটী শক্তিশালী রাজ্য বর্ত্তমান ছিল,—মরাঠা, মহীশূর ও নিজামরাজ্য। এই তিন রাজ্যের মধ্যে নিজাম রাজ্যই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ছিল। অতএব ওয়েলেস্‌লি সর্ব্বপ্রথমে নিজামকে উপরিউক্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। নিজামও অল্পদিন পূর্ব্বে মরাঠাদিগের হস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন,

সুতরাং ইংরাজের আশ্রয় তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ওয়েলেস্‌লির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ইংরাজরাজের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হইলেন। তিনি তাহার ফরাসী সৈন্যগণকে ছাড়াইয়া দিলেন ও তাহাদের পরিবর্ত্তে একদল ইংরাজ সৈন্য গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি স্বীকার করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তিনি কাহারও সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিবেন না। ইংরাজদিগের সহিত এই সন্ধির ফলে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যেরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ।—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেস্‌লি টিপুকে নিজামের ন্যায় সন্ধিতে আবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু টিপু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের চিরশত্রু। সুতরাং সহজেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। ওয়েলেস্‌লি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া স্বয়ং যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ইংরাজ ও নিজামের সৈন্য সমবেত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজ রাজধানীতে পলায়ন করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি হ্যারিস্ তাঁহার রাজধানী শ্রীরঙ্গ-পত্তন আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু নিহত হইলেন। টিপুর মৃত্যুর পর, তাঁহার রাজ্যের মধ্যভাগ মহী-শূরের পুরাতন হিন্দুরাজাদিগের একজন বংশধরকে প্রদান করা হইল, কিয়দংশ সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ নিজামকে দেওয়া হইল, এবং অবশিষ্ট অংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। টিপুর পুত্রেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইলেন। টিপুর সহিত ইংরাজের এই যুদ্ধ চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ।—টিপুর পর মরাঠাদের পালা আসিল এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।—১। পেশোয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধুনা নামমাত্র অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৭৫

খ্রীষ্টাব্দে মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা ফড়নবিশেরই হস্তে প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল।

দ্বিতীয় বাজীরাও।

২। বরোদার গায়কবাড়,—ইনি সমস্ত গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ৩। সিন্ধিয়া,—ইনি প্রকৃত ক্ষমতাশালী ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের অনেক অংশ সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, এবং দিল্লীর বাদসাহ ইঁহার ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন। ৪। হোলকার,—ইনি ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে ছিলেন। ৫। নাগপুরের ভোঁসলা,—ইনি বেরার হইতে উড়িষ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি নিজাম রাজ্যের ন্যায় মরাঠা রাজ্যসমূহকেও ইংরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা ফড়নবিশ এরূপ সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না এবং যতদিন তিনি জীবিত

ছিলেন, ততদিন ওয়েলেস্‌লি কৃতকার্য্য হন নাই। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানার মৃত্যুর পর মরাঠাদের মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়া পেশোয়াকে হস্তগত করিলেন ও তাহার ফলে উভয়ের সহিত হোলকারের বিবাদ বাধিল। পরিশেষে হোলকারের নিকট পরাস্ত হইয়া পেশোয়া ইংরাজদিগের শরণাগত হইলেন, এবং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর বাসিন নগরে তাঁহাদের সহিত এক সন্ধি করিয়া ইংরাজরাজের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইতে স্বীকার করিলেন। নিজামের সহিত ইংরাজদের সন্ধিতে যেরূপ সর্ত্ত ছিল, এ সন্ধিতেও সেইরূপ সর্ত্ত রহিল। সন্ধি হইবার পরেই গবর্ণর জেনারলের সহোদর সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি (ভবিষ্যতে সুবিখ্যাত ডিউক অব ওয়েলিংটন) একদল ইংরাজ সৈন্য সহ পুণায় গিয়া পেশোয়াকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন। এদিকে পেশোয়াও নিজ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইংরাজের অধীনতা পাশ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য গোপনে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। ফলে ইংরাজদিগের সহিত সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার যুদ্ধ উপস্থিত হইল (১৮০৩)। এই যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। লর্ড ওয়েলেস্‌লি স্বয়ং যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন। সার আর্থার ওয়েলেস্‌লি দাক্ষিণাত্যে ও লর্ড লেক উত্তর ভারতে যুদ্ধ পরিচালনার ভার পাইলেন। সার আর্থার সুবিখ্যাত আসাই ও আর্গাওয়ের যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও রঘুজি ভোঁসলার সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। এদিকে লর্ড লেক আলিগড় ও লাসোয়ারির যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা গ্রহণ করিলেন। বাদসাহ সা-আলম পুনর্ব্বার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা গবর্ণর জেনারলের নিকট সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। উভয়ের সহিত পৃথক্ পৃথক্ সন্ধি হইল। সিন্ধিয়া যমুনা ও

গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী তাঁহার যাবতীয় অধিকার ইংরাজের হস্তে প্রদান করিলেন, এবং ভোঁস্‌লা সমগ্র উড়িষ্যাপ্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে, এবং বেরারপ্রদেশ ইংরাজের বন্ধু নিজামকে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। উভয়েই স্বীকার করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তাঁহারা কোন ইউরোপীয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। তদ্ভিন্ন সিন্ধিয়া নিজ রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই প্রকারে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া ওয়েলেস্‌লি কোম্পানির ভারতবর্ষীয় অধিকার অনেকদূর বিস্তৃত করিলেন। গায়কবাড় ও রাজপুত রাজগণ ইতঃপূর্ব্বেই ইংরাজরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ।—হোলকার উল্লিখিত যুদ্ধের সময় উদাসীন ছিলেন। এখন তিনি রাজপুতানায় ইংরাজের আশ্রিত রাজ্যসমূহে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হোলকারকে নিষেধ করাতে তিনি অনেক অন্যায় ওজর ও দাবি করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেনাপতি ওয়েলেস্‌লি ও লেক হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যগণ প্রথমে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না, এমন কি কর্ণেল মনসনের অধীনে একদল ইংরাজ সৈন্য প্রায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরে দীঘনামক স্থানে হোলকারের সৈন্যগণ পরাজিত হইল। ভরতপুরের জাঠরাজা হোলকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক ভরতপুরের কেল্লা অবরোধ করিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারিলেন না।

ওয়েলেস্‌লির পদত্যাগ।—ইহার অল্পদিন পরে ওয়েলেস্‌লি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্ভিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ডিরেক্টরেরা বণিক ছিলেন, অর্থাগমের দিকেই তাঁহাদের অধিক লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্য বিস্তার প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাঁহারা

মোটেই পছন্দ করিতেন না। সুতরাং ওয়েলেস্‌লির অবলম্বিত রাজনীতি তাঁহারা অনুমোদন করিলেন না। অগত্যা যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ওয়েলেস্‌লি কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ওয়েলেস্‌লির ভারত-শাসনের ফল :—ওয়েলেস্‌লি ভারতে ইংরাজকে রাজচক্রবর্ত্তী করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহার সে সঙ্কল্প প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল, কেবল ডিরেক্টরগণের বুদ্ধির দোষে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি যে সময় এদেশে আসেন, সে সময় ইংরাজ অধিকার অধিকদূর বিস্তৃত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তে আসাম হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ভূভাগ এবং দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান, উত্তর সরকার প্রদেশ ও তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের পর প্রাপ্ত টিপুর রাজ্যের কিয়দংশ মাত্র ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। দেশীয় রাজগণের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তে অযোধ্যার নবাব ও দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের নবাব তাঁহাদের অনুগত ছিলেন। যখন ওয়েলেস্‌লি স্বদেশে ফিরিয়া যান তখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কিয়দংশ ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। নিজাম, গায়কবাড় ও রাজপুত রাজগণ ইংরাজরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পেশোয়া, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা ইংরাজশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। টিপুর শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল ও তাঁহার রাজ্য হইতে ইংরাজের আশ্রিত এক হিন্দু রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ওয়েলেস্‌লি দাক্ষিণাত্যের আর দুইটী রাজ্য ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোর রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া দুই জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ওয়েলেস্‌লি দুই জনকেই বৃত্তি দিয়া সরাইয়া দেন ও তাঞ্জোর রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। পর বৎসর কর্ণাটের নবাবকেও ঐরূপে অপসারিত করিয়া কর্ণাট অধিকার করেন। কর্ণাটের নবাব টিপুর সহিত

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তাঁহার এই দুর্দ্দশা হয়। ১৮০১ অযোধ্যার নবাব ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কড়া, এলাহাবাদ রোহিলখণ্ড প্রদেশ কোম্পানিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন।
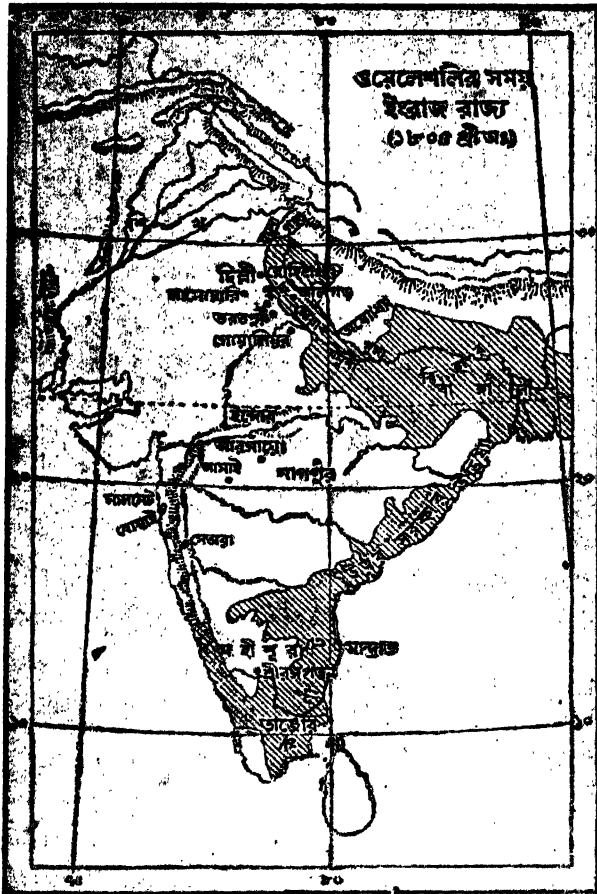
দেশহিতকর কার্য্য।—ওয়েলেস্‌লি যে কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ

লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি কতকগুলি দেশহিতকর কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সেকালে সন্তান না হইলে বা মৃতবৎসা হইলে অনেক রমণী মানত করিত যে, সন্তান হইলে একটী সন্তান গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিবে। নিক্ষিপ্ত সন্তান অন্যে তুলিয়া লইত ও পরে মাতা মূল্য দিয়া তাহাকে কিনিয়া লইত। কিন্তু অনেক সময় শিশুকে তুলিতে পারা যাইত না। এইরূপে অনেক শিশুর মৃত্যু হইত। ওয়েলেস্‌লি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম্ নামে কলেজ স্থাপন করেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সার জর্জ্জ বার্লো ও লর্ড মিণ্টো।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (দ্বিতীয়বার)।—ওয়েলেস্‌লি স্বদেশযাত্রা করিবার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে কলিকাতায় উপনীত হন। ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে উপায়ে হউক যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া ভারতে শান্তিস্থাপন করিতে হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্র বর্ষাকালেই উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে গাজিপুরে পীড়িত হইয়া ৫ই অক্টোবর মানবলীলাসম্বরণ করিলেন।

সার জর্জ্জ্ বার্লো।—কর্ণওয়ালিসের মৃত্যুর পর গবর্ণর জেনারলের কাউন্সিলের প্রধান মেম্বর সার জর্জ্জ্ বার্লো ভারতবর্ষের শাসন-

ভার গ্রহণ করিলেন। সার জর্জ্জ্ বার্লো ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর কাল গবর্ণর-জেনারলের কার্য্য করেন। শাসনভার গ্রহণ করিবার পরেই সার জর্জ্জ্ ডিরেক্টর-সভার ইচ্ছামত হোলকারের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। এই সন্ধি সংস্থাপিত হইবার পর হোলকার, সিন্ধিয়া এবং তাঁহাদের মিত্র রোহিলাসর্দ্দার আমীর খাঁ রাজপুতানায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মিত্র রাজ্যগুলির উপর নির্বিবাদে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়ার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বীকার করিলেন যে, অতঃপর যমুনা নদী ও বুন্দেলখণ্ড ইংরাজ রাজ্যের সীমা হইবে।

বেল্লোরের বিদ্রোহ।— ইহার পর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজের সন্নিহিত বেল্লোর নামক স্থানে অবস্থিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সিপাহী সৈন্য-দল বিদ্রোহী হইল। এই সিপাহীদের মাথার পাগড়ী পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, তাহারা মনে করিয়াছিল যে, শীঘ্র তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করা হইবে। এই আশঙ্কায় তাহারা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল। এই সময়ে টিপু সুল-তানের পুত্রগণ বেল্লোর নগরে বাস করিতেছিলেন। ইঁহারা সম্ভবতঃ বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সার জর্জ্জ বার্লো অবিলম্বে এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু এই কারণে ডিরেক্টর-সভা মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে পদত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। টিপু সুলতানের পুত্রগণকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর কোম্পানি সার জর্জ্জ বার্লোকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

লর্ড মিণ্টো।—লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৬ বৎসর কাল ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারলের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ডিরেক্টর-সভা লর্ড মিণ্টোকে উদাসীন রাজনীতি অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টোও যতদূর সাধ্য সেই আদেশ মত কার্য্য করিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজ-গণের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না।

রণজিৎ সিংহ।
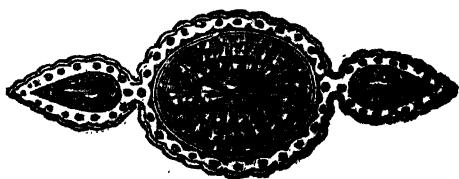
কোহিনুর।

(রণজিৎ সিংহ ইহা বাহুতে পরিতেন ; ইহা এক্ষণে আমাদের সম্রাটের সম্পত্তি।)

লর্ড মিণ্টোর পররাষ্ট্রনীতি।—লর্ড মিণ্টোর শাসনকা-
ইউরোপখণ্ডে ইংরাজেরা মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃ

হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লর্ড ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের ক্ষমতার বিলোপসাধন করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহারা পারস্য, পঞ্জাব প্রভৃতি সন্নিহিত দেশসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারে সেইজন্য লর্ড মিণ্টো পারস্য, আফগানিস্তান, ও পঞ্জাব এই কয় প্রদেশের অধিপতিদিগের নিকট সুযোগ্য রাজনীতিবিশারদ তিন জন প্রধান রাজপুরুষকে দূতস্বরূপে প্রেরণ করেন। এই সময় শিখরাজ রণজিৎ সিংহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন, আর স্বীকার করেন যে তিনি কখনও শতদ্রুনদী পূর্ব্বপারস্থ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত শিখরাজ্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সিন্ধুদেশের আমীরেরাও এই সময় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত চিরদিন বন্ধুত্ব রাখিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সকল সন্ধিবন্ধনের পরে লর্ড মিণ্টো ফরাসীদের অধিকৃত মরীচদ্বীপ ও ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ অধিকার করেন এবং তজ্জন্য 'আর্ল' উপাধিতে ভূষিত হন। ৫ বৎসর পরে যবদ্বীপ প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু মরীচদ্বীপ ইংরাজ অধিকারেই থাকিয়া যায়।

বুন্দেলখণ্ড ও নাগপুর।—এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে কয়েকজন সামন্ত-রাজা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে দেশে ঘোর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারল এরূপ অশান্তি দমন করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। তিনি সৈন্য পাঠাইয়া সেই গোলযোগ নিবারণ করিলেন। এই উপলক্ষে অজয়গড় ও কালিঞ্জরের দুর্গ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল।

রোহিলা সর্দ্দার আমীর খাঁ এই সময়ে ভোঁসলার রাজ্য নাগপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া ভোঁসলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। মিণ্টো একদল ইংরাজ সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া আমীর খাঁকে তাড়াইয়া দিলেন।

উদাসীন নীতির কুফল।—কিন্তু এই দুই স্থল ব্যতীত মিণ্টো আর কোথাও ডিরেক্টরগণের অনুমোদিত উদাসীন-নীতি উল্লঙ্ঘন করেন

নাই। ফলে পশ্চিম ও মধ্যভারত, লুণ্ঠন, অত্যাচার ও অশান্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পিণ্ডারি নামক দুর্দ্দান্ত দস্যুর দলকে পূর্ব্বে মালব ও রাজপুতানা অঞ্চলে দেখা যাইত, এখন তাহারা প্রবল হইয়া দক্ষিণ ভারতে পর্য্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। রাজপুতানার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। সেখানে উদয়পুরের মহারাণার কন্যা কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য জয়পুররাজ ও যোধপুররাজের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে বিবাদে প্রায় সকল রাজপুত রাজাই যোগদান করিয়াছিলেন। রোহিলা সর্দ্দার আমীর খাঁ ইত্যবসরে বিভিন্ন পক্ষকে সাহায্য করিবার ছলে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবশেষে আমীর খাঁয়ের পরামর্শে কৃষ্ণকুমারীকে বিষ দিয়া হত্যা করা হয়।

কোম্পানির নূতন সনন্দ।—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২০ বৎসর অন্তর বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনের জন্য নূতন সনন্দ লইতে হই ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা সনন্দ পাইয়াছিলেন, সুতরাং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সনন্দের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি পুনর্ব্বার নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এবার সনন্দ দিবার সময়, ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত করিয়া দিলেন, এবং অন্যান্য ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কেবল চীনদেশের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য কোম্পানির হস্তে থাকিল কোম্পানিকে রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা প্রজার শিক্ষার্থ ব্যয় করিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচারকগণ কোম্পানির রাজ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার অনুমতি পাইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড হেষ্টিংস্।

লর্ড হেষ্টিংস্।—লর্ড মিণ্টোর পর আরল্ অব্ ময়রা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন। ইনি পরে 'মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্' উপাধি পান এবং সেই নামেই ইনি অধিক পরিচিত। লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর ৪ মাস কাল ভারতবর্ষের শাসন

লর্ড হেষ্টিংস্।
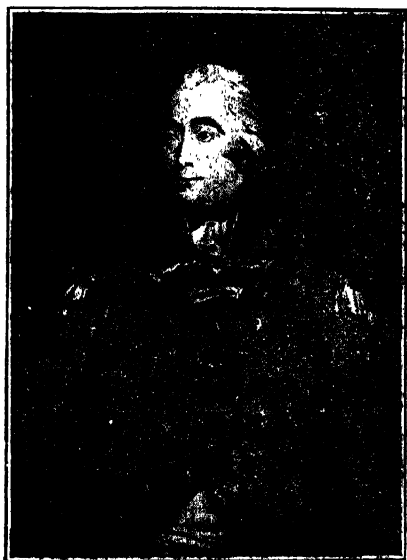
কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর-জেনারলগণের উদাসীন-নীতি অবলম্বন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের তদানীন্তন অবস্থায় যে সে নীতি ঘোর অমঙ্গলজনক তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সে অনিষ্টকর নীতি পরিত্যাগ করিয়া

ভারতের শান্তিভঙ্গকারীদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার জন্য তাঁহাকে তিনটী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়,—(১) নেপাল যুদ্ধ, (২) পিণ্ডারি যুদ্ধ ও (৩) মরাঠা যুদ্ধ। ওয়েলেস্‌লি তাঁহার কার্য্যের যেটুকু অবশিষ্ট রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, লর্ড হেষ্টিংস সেটুকু সম্পন্ন করেন।

নেপাল যুদ্ধ।—নেপালের বর্ত্তমান গুরখা রাজবংশ তথাকার আদিম নিবাসী নহেন। ইঁহারা রাজপুতবংশীয়। এই বংশ রাজপুতানা হইতে আগমনপূর্ব্বক ঐ দেশের অধিবাসী হন, এবং ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তথাকার নেয়ার অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া নেপালে আপনাদিগের আধিপত্য সংস্থাপন করেন। অতঃপর গুরখারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত স্থানসমূহের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। সার জর্জ্জ বার্লো ও লর্ড মিণ্টো তাহাদিগকে উক্ত অন্যায় কার্য্য করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথম যুদ্ধে ইংরাজদিগের বিশেষ সুবিধা হইল না। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত সেনাপতি অক্‌টরলোনি নেপালের অধিকৃত মালোন দুর্গ অধিকার করিলেন এবং পর বৎসর তিনি সমুদয় বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক নেপালের রাজধানীর সন্নিকটে উপনীত হইলেন। এইবার গুরখারা ভীত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল, এবং ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিগৌলি নগরের সন্ধিদ্বারা যুদ্ধের অবসান হইল। এই সন্ধিসূত্রে নেপাল দরবার পূর্ব্বদিকে সিকিম পরিত্যাগ করিলেন, এবং পশ্চিমে কমায়ুন ও গড়োয়াল নামক পার্ব্বত্য প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিলেন। অধুনা এই প্রদেশে সিমলা, নৈনীতাল, মসৌরী, আল্‌মোরা প্রভৃতি কয়টী পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যকর নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নেপাল দরবার নিজ রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্টকে স্থান দিলেন। অদ্যাবধি এই সন্ধি অনুসারেই নেপালের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের

সমুদয় রাজনৈতিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অধুনা গুরখাদিগের মধ্য হইতে আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গুরখা সৈন্যদল নেপালের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীনে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই নেপাল যুদ্ধের পরই গবর্ণর-জেনারেল 'মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস' উপাধি পান।

পিণ্ডারি যুদ্ধ।—পিণ্ডারি নামক দস্যুদলের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই দল নানাজাতীয় ও নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হইয়াছিল। আফগান, মরাঠা, জাঠ প্রভৃতি সকল প্রকার জাতির লোক হইতেই এই দলের পুষ্টিসাধন হইত। সকল জাতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত চোর, ডাকাত ও বদমাশ লোকেরা আসিয়া পিণ্ডারি দলে প্রবেশ করিত। এই প্রকারে এই দলে প্রায় ২৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। চিতু, করিম প্রভৃতি পিণ্ডারিদলের অধিনায়কগণ এই সৈন্যের সাহায্যে মধ্য ভারতবর্ষের নানাস্থানে লুঠ ও নরহত্যা করিতে থাকে। মালব প্রদেশে ইহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। মহারাষ্ট্রীয়রাজগণ তলে তলে ইহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস মনুষ্যজাতির এই সাধারণ শত্রুদিগকে দমন করিবার জন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। এই সৈন্যদল তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন দিক্ হইতেই পিণ্ডারিদিগকে আক্রমণ করতঃ বিধ্বস্ত করিয়া দিল। করিম ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। চিতু জঙ্গলে পলায়ন পূর্ব্বক ব্যাঘ্রের মুখে জীবন বিসর্জ্জন দিল।

চতুর্থ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ।—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। পেশোয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বাসিন্ নগরে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া নিজরাজ্য রক্ষার্থ ইংরাজসৈন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বা-

হার্থ নিজরাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পেশোয়াকে আর একটী সন্ধি করিতে বাধ্য করেন। এই সন্ধিসূত্রে পেশোয়াকে নিজরাজ্যের আরও কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে হয়, এবং স্বীকার করিতে হয় যে, বরোদার গায়কবাড় অতঃপর পুণার অধীন না থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবেন, এবং নিজাম বা গায়কবাড়ের সহিত পেশোয়ার কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার মীমাংসা করিবেন। বাজীরাও এই কারণে আপনাকে অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন, এবং হোলকার দরবার ও নাগপুরের রাজা আপ্পাসাহেব ভোঁসলাকে নিজের পক্ষে টানিয়া লন। এই সময়ে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব পুণানগরীতে কোম্পানির রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি পেশোয়ার মতিগতি ভাল নহে বুঝিয়া কির্‌কী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পেশোয়ার সৈন্যগণ রেসিডেন্সিতে আগুন লাগাইয়া কির্‌কী আক্রমণ করিল। লর্ড হেষ্টিংস ইতঃপূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্য বিলক্ষণ বীরত্ব সহকারে পেশোয়ার সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিল, এবং পেশোয়া নিজ রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে আপ্পা সাহেবের সৈন্যগণ সিতাবালদীতে ইংরাজ রেসিডেণ্টকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। হোলকারের সৈন্যগণও এই সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেহিদপুরের যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল।

যুদ্ধের অবসান হইলে, লর্ড হেষ্টিংস্ পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজ অধিকারভুক্ত করিলেন এবং তাহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্নিবিষ্ট হইল। পেশোয়া আত্মসমর্পণ করাতে তাঁহাকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া কাণপুরের সন্নিহিত বিঠুর গ্রামে নির্ব্বাসিত করা হইল। হোলকার-

রাজ্যের আয়তন কমাইয়া দেওয়া হইল এবং হোলকার ইংরাজরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। নাগপুরের রাজা আপ্পাসাহেব রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার সিংহাসনে একটী শিশু সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই শিশুর তত্ত্বাবধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

দেশহিতকর কার্য্য।—হেষ্টিংস এই প্রকারে পিণ্ডারি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বশে আনিয়া ভারতবর্ষে শান্তি সংস্থাপন করিলেন।

এক পঞ্জাব ভিন্ন সর্ব্বত্র ইংরাজেরা রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। লর্ড হেষ্টিংস্ অতি উত্তম শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে শিল্পকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইঁহারই শাসনকালে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়।

ঐ হিন্দু কলেজই অধুনা প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইঁহারই সময়ে শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ মিসনারিগণ অনেক স্কুল সংস্থাপন করেন, এবং বাঙ্গালাভাষায় অনেক পুস্তক ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "সমাচার-দর্পণ" নামে বঙ্গভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন। "সমাচার-দর্পণ"ই বোধ হয় ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় লিখিত আধুনিক ধরণের প্রথম সংবাদ-পত্র। কেহ কেহ বলেন, "সমাচারদর্পণ" প্রকাশের দুই বৎসর পূর্ব্বে 'বেঙ্গল গেজেট' নামক একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড আমহার্ষ্ট।

আডাম সাহেব।—লর্ড হেষ্টিংস্ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই ভারত-বর্ষ ত্যাগ করেন। লর্ড হেষ্টিংসের ভারতবর্ষ ত্যাগ ও লর্ড আমহার্ষ্টের আগমন এই উভয়ের মধ্যে যে কয় মাস কাল অতিবাহিত হয়, ঐ সময়ে কাউন্সিলের প্রধান সদস্য আডাম সাহেব ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনকাল ব্রহ্মদেশের সহিত প্রথম যুদ্ধ ও ভরতপুর জয় এই দুইটী ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ।

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ।—অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে তিনটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, সমুদ্রকূলে আরাকান, ইরাবতীতীরে আবা, এবং ইরাবতীর সাগরসঙ্গমের নিকটে পেগু। এই তিন রাজ্যে অনেক দিন অবধি পরস্পর যুদ্ধ হইতে থাকে। পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারকালে অনেক দুর্বৃত্ত ইউরোপীয় দস্যু আরাকানে বাস করে। ইহাদিগের সাহায্যে

আরাকানের অধিবাসী মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আলম্প্রা নামক কোন ব্যক্তি আবাপ্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক আবায় রাজধানী সংস্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরেরা কালক্রমে সমগ্র ব্রহ্মদেশের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং ক্রমে আসাম ও আরাকানের সন্নিহিত ইংরাজাধিকারসমূহের উপরেও অত্যাচার আরম্ভ করেন। এই সময়ে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। গবর্ণর-জেনারেল ব্রহ্মরাজকে প্রথমে অনেকবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এক দল ইংরাজসৈন্য ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসাম আক্রমণ করিল। হিন্দু সিপাহীরা সমুদ্রযাত্রা করিবে না বলিয়া স্থলপথে চট্টগ্রাম হইয়া আরাকানে উপস্থিত হইল, এবং আর এক দল সিপাহী মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে ইরাবতীর মুখে উপস্থিত হইল। এই সময়ে এক দল সিপাহী ব্রহ্মদেশে যাইবার জন্য আদিষ্ট হওয়াতে বিদ্রোহী হয়। কিন্তু গবর্ণর-জেনারল শীঘ্রই তাহাদের বিদ্রোহ নিবারণ করেন। প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হইল। ইংরাজপক্ষে পীড়াবশতঃ প্রায় ২০ হাজার লোক মারা পড়িল, এবং ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইল। অবশেষে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হইয়া ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ান্দাবু নামক স্থানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধিবন্ধন করিলেন। এই সন্ধিসূত্রে ব্রহ্মরাজ আসাম, আরাকান ও টেনাসরিম ইংরাজ হস্তে প্রদান করিলেন, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণার্থ এক কোটি টাকা দিলেন।

ভরতপুর জয়।—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হয় এবং রাজার নাবালক পুত্র তদীয় পিতৃব্যকর্তৃক সিংহাসনে সংস্থাপিত হন। এই সময়ে নাবালকের একজন জ্ঞাতি রাজ্যের সৈন্যদিগকে হস্তগত করিয়া নাবালক রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে, এবং নাবালকের তত্ত্বাবধায়ককে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইতঃপূর্ব্বে

ঐ বালককে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং সংবাদ পাইবামাত্র লর্ড আমহার্ষ্ট নাবালককে সিংহাসনে পুনঃসংস্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে ভরতপুরে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লর্ড কম্বরমিয়র এই যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া ভরতপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ-প্রাচীর বারুদ দিয়া উড়াইয়া দিলেন। অতঃপর নাবালক রাজা তাঁহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধকালে লর্ড লেক ভরতপুর দুর্গ গ্রহণ করিতে গিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। এবার সে কলঙ্ক অপনোদিত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।—লর্ড আমহার্ষ্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮ হইতে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই মহাত্মার শাসনকালে যুদ্ধাদি আড়ম্বরের কার্য্য প্রায় কিছুই হয় নাই, কিন্তু তিনি ভারতবাসীর নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার জন্য ভারতবাসী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন এবং সেই সময় মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেল্লোরনামক স্থানে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ হওয়াতে ডিরেক্টর সভা বেণ্টিঙ্ককে কার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা জান। লর্ড বেণ্টিঙ্ককে

মান্দ্রাজের শাসনকার্য্য হইতে অপসারিত করা যে ডিরেক্টর-সভার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কার্য্য হয় নাই, তাহা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত করাতেই বুঝা যাইতেছে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির জন্য প্রসিদ্ধ।—(১) রাজস্ব ও শাসন-সংস্কার। (২) সতীদাহ ও অন্যান্য কুপ্রথা নিবারণ। (৩) ঠগী দমন। (৪) কুর্গ ও কাছাড় অধিকার এবং মহীশূরে সুশাসনের ব্যবস্থা। (৫) কোম্পানির নূতন সনন্দ গ্রহণ। (৬) শিক্ষা-সংস্কার।

রাজস্ব ও শাসন-সংস্কার।—ব্রহ্মযুদ্ধে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা ঋণ হয় এবং আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই সমতা সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে

প্রথমতঃ অনেক নিয়মিত ব্যয় কমাইয়া দিলেন। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ভূমির পূর্ব্বে করধার্য্য করা হয় নাই, তৎসমুদয়ের উপর করধার্য্য করিয়া ভূমির রাজস্ববৃদ্ধি করিলেন, এবং তৃতীয়তঃ, মালবদেশীয় অহিফেনের উপর মাসুল সংস্থাপন করিলেন।

বিচার-কার্য্যের সুবিধার জন্য বেণ্টিঙ্ক বিচারালয়সমূহের ও বিচার-প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। পূর্ব্বে লর্ড কর্ণওয়ালিস কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে "প্রবিন্সিয়াল কোর্ট" নামে যে চারিটী আদালত সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বেণ্টিঙ্ক সেগুলি উঠাইয়া দিয়া জেলার জজদিগের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। তিনি কয়েকটী জেলা লইয়া এক এক বিভাগ গঠিত করিলেন এবং প্রত্যেক বিভাগের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্য পরিদর্শনের জন্য একজন করিয়া কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। পূর্ব্বে আদালত সমূহে ফারসী ভাষাতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ফারসীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। পূর্ব্বে দেশীয় লোকগণকে মাত্র মুন্সেফী ও দারোগা-গিরি কার্য্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত, কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক সদর আলা ও ডেপুটী কালেক্টার পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে দেশীয় লোককে গ্রহণ করতঃ দেশীয়গণকে উচ্চতর রাজকার্য্যের অধিকার দিলেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ সুবিধা হইল। বেতন অধিক বলিয়া তাঁহারা অধিক সংখ্যক ইংরাজ বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিতেন না। ফলতঃ বিচারকের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, সামান্য মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেও অযথা বিলম্ব হইত। এক্ষণে অনেকগুলি দেশীয় সহকারী বিচারক নিযুক্ত হওয়াতে এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইল, এবং সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকার্য্যে উপযুক্ত দেশীয়গণকে যত অধিক পরিমাণে লইতে পারা যায়, ততই রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

সতীদাহ ও অন্যান্য কুপ্রথা নিবারণ।—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে

পতির মৃত্যু হইলে সহমরণ অথবা ব্রহ্মচর্য্য বিধবার কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে। ফলে পূর্ব্বকালে অনেক হিন্দু বিধবা মৃত স্বামীর চিতায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেন। আকবর বাদসাহ এই নিষ্ঠুর ব্যাপার নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনারলগণ নবার্জ্জিত দেশের অধিবাসীদিগের আচারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক দয়াপ্রণোদিত হইয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই প্রচার করিলেন যে, সতীদাহ করিলে উক্ত কার্য্যে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ হত্যাপরাধে অপরাধী হইবে। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায় শাস্ত্রাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক সহমরণ-নিবারণ কার্য্যে বেণ্টিঙ্কের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজপুত জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। এই কারণে অনেক দরিদ্র রাজপুত নবপ্রসূতা কন্যাকে মারিয়া ফেলিত। বেণ্টিঙ্কের যত্নে এই নিষ্ঠুর প্রথা অনেক পরিমাণে নিবারিত হয়। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী খোন্দজাতির বিশ্বাস ছিল, নরশোণিতে পৃথ্বীদেবীকে তৃপ্ত করিতে পারিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, এই জন্য তাহারা প্রতি বৎসর অনেক নরবলি দিত। বেণ্টিঙ্ক এই নৃশংস প্রথা রহিত করেন।

ঠগ্ দমন।—ঠগ্‌দিগের নাম প্রত্যেক ভারতবাসীই শুনিয়া থাকিবেন। ঠগেরা ভয়ানক দস্যু ছিল। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ব্যবসায়ী এবং সন্ন্যাসীর আকারে আত্মগোপনপূর্ব্বক পথিকদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া অবশেষে সুযোগ পাইলে গলায় গামছামোড়া দিয়া উহাদের প্রাণবধ ও সর্ব্বস্বহরণ করিত। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঠগদিগকে দমন করিবার জন্য কর্ণেল শ্লীম্যানকে ঠগী কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। কর্ণেল শ্লীম্যানের অনবরত চেষ্টায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু ঠগ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। ক্রমে এই প্রকারে এই ভয়ানক দস্যুদল সমূলে বিনষ্ট হইল।

কুর্গ ও কাছাড় অধিকার এবং মহীশূররাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা।—বেন্টিঙ্ক শান্তি ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজ্যজয় করিবার অভিলাষ তাঁহার ছিল না। কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে কোন কোন দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে কুর্গপ্রদেশের রাজা নিজরাজ্যে অতিশয় অত্যাচার করিতেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক রাজাকে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেন্টিঙ্ক তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজা যুদ্ধে পরাজিত, এবং ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া কাশীবাস করিলেন ও কুর্গরাজ্য তত্রত্য প্রধান লোকদিগের প্রার্থনানুসারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল।

লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে কাছাড় রাজ্যও ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাছাড়ের রাজা শত্রুকর্তৃক নিহত হন। রাজার পুত্রাদি না থাকাতে প্রজাদিগের প্রার্থনামত গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য গ্রহণ করিলেন।

মহীশূর-রাজ্যেও নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূর শাসন করিবার জন্য উপযুক্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন থাকে। তাহার পর উহা দেশীয় রাজার হস্তে পুনঃপ্রদত্ত হইয়াছে।

কোম্পানির নূতন সনন্দ।—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দ্বারা কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য ভারতশাসনের ইজারা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই সময় হইতে কোম্পানির কারবার করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। রাজ্য বহুবিস্তৃত হওয়াতে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের এই সংস্কার জন্মে যে, কারবার ও রাজ্যশাসন যুগপৎ চলিতে পারে না। সুতরাং এই সময় হইতে কোম্পানিকে কারবারি ত্যাগ করিয়া কেবল রাজ্যশাসন কার্য্যেই মনোনিবেশ করিতে হইল। এই সনন্দের মর্ম্মানুসারে গবর্ণর-জেনারলের

কাউন্সিলে একজন ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লর্ড মেকলে প্রথম ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত হইলেন। এদেশের আইনের সংস্কার সাধন করিবার জন্য একটী 'ল কমিশন' গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। দেশীয়েরা সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার পাইলেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে জমি লইয়া বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। আগরা ও অযোধ্যা লইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হইল।

শিক্ষা সংস্কার।—লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে দেশীয়গণের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হয়। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা কার্য্যের উন্নতির জন্য বাৎসরিক যে টাকা ব্যয় করিতেন তাহা এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য নিয়োজিত হইত। কিন্তু লর্ড মেকলে প্রভৃতি বলিলেন যে কেবল প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে না। ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইলে ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা প্রাচ্যভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা এ প্রস্তাবের বিরোধী হইলেন। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক ইংরাজী শিক্ষার অনুকূলেই মত দিলেন। ফলে আমাদিগের কি মহোপকার হইয়াছে তাহা এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার গুণে আজ আমরা সভ্য-জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষা শিক্ষা-সম্বন্ধেও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের মাতৃভাষারও অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়েই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হয়।

রাজা রামমোহন রায়।—সমাজ-সংস্কারাদি বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় লর্ড বেণ্টিঙ্কের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ন্যায় মনীষী অল্পই দেখা যায়। তিনি এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন ও ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে

২৩শে জানুয়ারী তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং সেই বৎসর তদানীন্তন নামমাত্রসার দিল্লীর বাদসাহের অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন করেন। বাদসাহ রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট বাদসাহের বার্ষিক বৃত্তি আরও তিন লক্ষ টাকা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে আর কোন শিক্ষিত ভারতবাসী ইংলণ্ডে যান নাই। তিনি তথায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সেইখানেই দেহ-ত্যাগ করেন।

রাজা রামমোহন রায়

সার্ চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্ ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা।—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশযাত্রা করেন, এবং গবর্ণর জেনারলের কাউন্সিলের প্রধান মেম্বর সার্ চার্ল্‌স্ মেট্‌কাফ্ (পরে লর্ড মেট্‌কাফ্) শাসনভার গ্রহণ করেন। মেট্‌কাফ্ অতি উপযুক্ত ও প্রজা-হিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার এক বৎসর মাত্র শাসনকালে ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের একটী মহোপকার সাধিত হয়। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ছিল না, অর্থাৎ সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষগুণ বিচার করিবার অধিকার ছিল না। মেট্‌কাফ্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মেট্‌কাফের প্রতি ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল, এবং ডিরেক্টর সভা ইঁহাকেই গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে ইংলণ্ডে মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তন হওয়াতে মেট্‌কাফ্‌কে পদত্যাগ করিতে হইল,

এবং লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারলের পদে অভিষিক্ত হইলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

-:০:-

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ও লর্ড এলেন্‌বরা।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬ বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড।

ইঁহার শাসনকালে আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম যুদ্ধ হয়। অক্‌ল্যাণ্ডের শাসনকালের এই একমাত্র প্রধান ঘটনা। আফগান

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে লর্ড অক্ল্যাণ্ড রাজস্বের অবস্থার অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ।—আফগানরাজ আমেদ সা আবদালির পর তাঁহার পুত্র টাইমুর আফগানিস্তানের অধিকারী হন। টাইমুরের মৃত্যু হইলে আমেদসার অন্যতম পৌত্র জামান সা ও জামান সার পর তাঁহার ভ্রাতা সা সুজা আফগান রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। এই সা সুজার নিকটেই লর্ড মিণ্টো দূত প্রেরণ করেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আফগানিস্তানের সন্ধিবন্ধন হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সা সুজা তাঁহার ভ্রাতা মামুদ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় আসিয়া অবস্থান করেন। মামুদও অধিকদিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাক্রান্ত বারাকজাই-বংশীয় দোস্ত মোহম্মদ তাঁহাকে নিহত করিয়া কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বারাকজাইবংশীয়েরা পূর্ব্বে আফগানরাজগণের মন্ত্রিত্ব করিতেন এবং সেই-জন্য দোস্ত মোহম্মদ 'আমীর' নামে পরিচিত ছিলেন। তদবধি কাবুলের অধিপতিরা 'আমীর' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

যৎকালে লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন দোস্ত মোহম্মদ কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই সময়ে রুসিয়ার গবর্ণমেণ্ট মধ্য এসিয়ায় নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং পারস্য ও কাবুলের রাজসভায় রুসিয়ার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। রুসিয়ার প্রসার দর্শনে আশঙ্কিত হইয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড দোস্ত মোহম্মদের সহিত সন্ধি করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দোস্ত মোহম্মদ বলিলেন যে, শিখ-রাজ রণজিৎসিংহ তাঁহার হস্ত হইতে পেশোয়ার নগর কাড়িয়া লইয়াছেন; যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রণজিৎসিংহকে লওয়াইয়া পেশোয়ার নগর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করাইতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি ইংরাজের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইবেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে

অসামর্থ্য জানাইলে দোস্ত মোহম্মদ রুসিয়ার দূতকে অধিক আদর দেখাইতে লাগিলেন। তখন গবর্ণর-জেনারল দোস্ত মোহম্মদকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাঁহার সিংহাসনে রাজ্যচ্যুত সা সুজাকে সংস্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, এবং এই অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের একদল সৈন্য সা সুজাকে সঙ্গে লইয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া বোলান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক আফগানিস্তানের অভিমুখে যাত্রা করিল (১৮৩৯)। শীঘ্রই কান্দাহার গৃহীত হইল, এবং জেনারল নট্ তথায় একদল সৈন্য লইয়া ছাউনী করিয়া রহিলেন; কিছুদিন পরে গজনি নগর ইংরাজের হস্তগত হইল এবং দোস্ত মোহম্মদ সাহায্যের চেষ্টায় হিন্দুকুশের অপর পারে বুখারায় পলায়ন করিলেন। অতঃপর ইংরাজ সৈন্য কাবুল অধিকার করিল, এবং সা সুজা মহা আড়ম্বরে বালা হিসার নামক স্থানে কাবুলের সিংহাসনে সংস্থাপিত হইলেন। পর বৎসর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মোহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং বন্দিস্বরূপে কলিকাতায় আনীত হইলেন।

সা সুজা সিংহাসন পাইলেন বটে, কিন্তু আফগানিস্তানের অধিবাসীদিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলেন না। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে দোস্ত মোহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আক্‌বর খাঁর অধীনে সমগ্র দেশ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। কাবুল-নগরের মধ্যস্থলেই ইংরাজ দূত নিহত হইলেন। হতভাগ্য সা সুজাও প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ বন্দী হইল। আফগানগণের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া দুই মাস পরে প্রবল শীতের সময়, কাবুলের ইংরাজ সৈন্য, সর্ব্বশুদ্ধ ১৫০০০ লোক, ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু এই ১৫০০০ লোকের মধ্যে ডাক্তার ব্রাইডন নামক একজন মাত্র সৈনিক কর্ম্মচারী ১২০ জন লোককে সঙ্গে লইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জেলালাবাদে পৌঁছিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অবশিষ্ট সকলেই শীতে, অনাহারে ও দুর্বৃত্ত আফগানদিগের অস্ত্রাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবার এক মাস পরেই, অর্থাৎ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড স্বদেশযাত্রা করিলেন, এবং লর্ড এলেন্‌বরা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। লর্ড এলেন্‌বরা যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও এই আফগান যুদ্ধের নিবৃত্তি হয় নাই। তখন কান্দাহারে জেনারল নট্‌ এবং জেলালাবাদে জেনারল সেল্‌ সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কাবুলে ইংরাজেরা প্রায় কেহই ছিল না, কেবল কয়েকজন মাত্র বন্দী স্ত্রী ও পুরুষ কারাগারে অবস্থান করিতেছিলেন।

লর্ড এলেন্‌বরা।—লর্ড এলেন্‌বরা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, কান্দাহার ও জেলালাবাদ হইতে নট্‌ ও সেল্‌ উভয়ের সৈন্যদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। কাবুলের হত্যাকাণ্ড ও সেনাদলের বিনাশহেতু ইংরাজ বীর্য্যের বিলক্ষণ দুর্নাম হইয়াছিল। সুতরাং লর্ড এলেন্‌বরা আফগান-দিগের ঘোর অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ জেনারল পলক্‌কে সসৈন্যে আফগানিস্তানে প্রেরণ করিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জেনারল পলক্‌ ও নট্‌ উভয়ের সৈন্য কাবুলে একত্র মিলিত হইল। তদনন্তর সমবেত সৈন্য গজ্‌নির দুর্গ বিনষ্ট করিল, কাবুলের প্রকাণ্ড বাজার বারুদের সাহায্যে উড়াইয়া দিল, এবং সকল বাঁধা অতিক্রম পূর্ব্বক ইংরাজ বন্দীদিগকে উদ্ধার করিল। এই প্রকারে ব্রিটিশ সিংহের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া, উক্ত সমবেত সৈন্য নিহত সা সুজার পরিবারদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত মোহম্মদ মুক্তিলাভ করিয়া আফগানিস্তানে গিয়া নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন। এই প্রকারে প্রথম আফগান যুদ্ধের অবসান হইল।

সিন্ধু অধিকার।—কিন্তু ইহাতেও যুদ্ধনিবৃত্তি হইল না। সিন্ধু-দেশ এতদিন পর্য্যন্ত মুসলমান আমীরদিগের শাসনাধীন ছিল। আমীরেরা

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন, এইরূপ এক অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল। লর্ড এলেন্‌বরা তাঁহাদের শাসনার্থ সেনাপতি সার চার্লস্‌ নেপিয়রকে সসৈন্যে সিন্ধুদেশে প্রেরণ করিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপিয়র হাইদরাবাদ এবং মিয়ানী নামক স্থানদ্বয়ে আমীরদিগের বেলুচি সৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন, এবং সিন্ধুপ্রদেশ কোম্পানির অধিকারে আসিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভূত হইল।

গোয়ালিয়র যুদ্ধ।—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারল আরও একটী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বৎসর গোয়ালিয়রের রাজা জনকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হয়। জনকজী নিঃসন্তান ছিলেন। এই জন্য তাঁহার স্ত্রী তারাবাই একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। লর্ড এলেন্‌বরা গোয়ালিয়রের অপ্রাপ্তবয়স্ক মহারাজের রাজ্যরক্ষার কার্য্যে একজন অভিভাবককে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজমাতা লর্ড এলেন্‌বরার নিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিভাবক বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এই জন্য গবর্ণর-জেনারল গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মহারাজপুর ও পুন্নিয়ার এই উভয় স্থানের যুদ্ধে ইংরাজের নিকট গোয়ালিয়রের সৈন্যগণ পরাজিত হইল। মহারাজপুরের যুদ্ধে লর্ড এলেন্‌বরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সন্ধি হইল। রাজমাতা রাজত্বের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। রাজ্য চালাইবার জন্য কাউন্সিল নিযুক্ত হইল।

এই সময়ে শাসনসংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন লইয়া লর্ড এলেনবরার সহিত ডিরেক্টর-সভার মতভেদ হইল। এজন্য ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সভা লর্ড এলেন্‌বরাকে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিলেন, এবং সার হেন্‌রী হার্ডিংকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

—:০:—

লর্ড হার্ডিং।

সার হেন্‌রী হার্ডিং (পরে লর্ড হার্ডিং) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ছিলেন। ইঁহার শাসনকালে ভারতের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। ফলতঃ বেণ্টিঙ্কের পর হার্ডিংই ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলেন। যে সকল কুপ্রথা লর্ড বেণ্টিঙ্ক

লর্ড হার্ডিং।

নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড হার্ডিং সেগুলি নিঃশেষ রূপে উঠাইয়া দেন। তিনি বাণিজ্যকার্য্যেরও বিলক্ষণ সুবিধা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষাকার্য্যের সুবিধার জন্য হার্ডিং অনেকগুলি বঙ্গ-বিদ্যালয় ও রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত করিয়া যান। হার্ডিং একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। ফরাসী-সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদের

যুদ্ধকালে হার্ডিং ইংরাজ পক্ষে একজন সেনানী ছিলেন। এই সময় এক যুদ্ধে তাঁহার একটী হাত নষ্ট হয়। শিখদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রথম যুদ্ধ ইঁহার শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

প্রথম শিখ যুদ্ধ।—পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের কথা তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রণজিৎসিংহ কাবুলের তদানীন্তন অধিপতি জামান সা কর্ত্তৃক লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে রণজিৎ সিংহ প্রায় এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক হন। সুদক্ষ ফরাসী সৈনিকগণ এই সেনাগণকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন। শিখ জাতির নাম অনুসারে এই শিখ সৈন্য 'খাল্‌সা' নামে অভিহিত হইত। এই সুশিক্ষিত সৈন্যের বলে রণজিৎ সিংহ শীঘ্রই লাহোরের স্বাধীন রাজা হন, এবং উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশোয়ার, দক্ষিণে মূলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু নদী এই চতুঃসীমার মধ্যে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে রণজিৎসিংহের সহিত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধিবন্ধন হয়, তাহা তোমরা জান। রণজিৎসিংহ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। রণজিতের উপযুক্ত পুত্র ছিল না। এই কারণে তাঁহার পর শিখরাজ্যে মহাগোলযোগ ঘটে। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিন চারিজন রাজা সিংহাসন অধিকার করেন। অবশেষে রণজিৎসিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র দলীপসিংহ পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে বালক মহারাজের বয়ঃক্রম ৫ বৎসর মাত্র ছিল বলিয়া তাঁহার মাতা মহারাণী ঝিন্দন রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণপূর্ব্বক প্রিয়পাত্র লালসিংহকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা খাল্‌সা সৈন্যদলের অধিনায়কদের হস্তগত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে রাজ্যে নানাপ্রকার বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে দুর্দ্দান্ত খাল্‌সা সৈন্যগণ যারপরনাই উচ্ছৃঙ্খল

হইয়া উঠিল। তখন তাহাদিগকে সংযত রাখিবার জন্য মহারাণীর শুভানুধ্যায়ী প্রধান মন্ত্রী লালসিংহ ও সেনাপতি তেজসিংহ তাহাদিগকে ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত দিল্লী প্রভৃতি স্থান লুটপাট করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন।
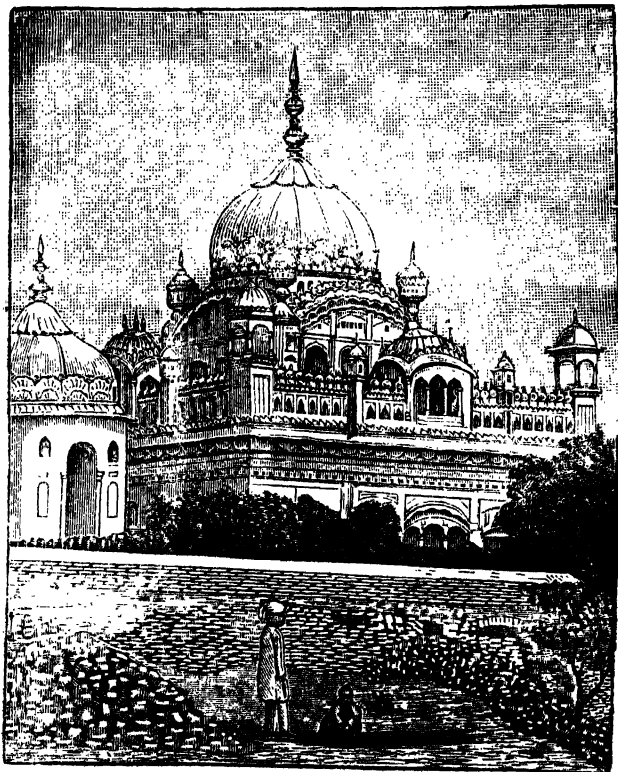
রণজিৎ সিংহের সমাধি-মন্দির।

এই সময়ে শতদ্রু নদী ইংরাজ ও শিখ উভয় রাজ্যের সাধারণ সীমা ছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে ৬০,০০১ শিখ সৈন্য বহুসংখ্যক কামান লইয়া শতদ্রুর অপরপারস্থ ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিল।

তখন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন, এবং স্বয়ং গবর্ণর জেনারল হার্ডিং ও প্রধান সেনাপতি সার হিউ গফ্ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। প্রায় চারি সপ্তাহের মধ্যেই মুদ্‌কি, ফিরোজসা, আলিওয়াল, ও সোব্রাঁও এই কয়স্থানের যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল (১৮৪৫-৪৬)। কিন্তু এই কয়টী যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ বলক্ষয় হইয়াছিল। ইংরাজ পক্ষে গবর্ণর জেনারল স্বয়ং প্রধান সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সোব্রাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শিখ সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া পলায়ন করিল, এবং শিখদিগের রাজধানী লাহোর ইংরাজের হস্তগত হইল। যুদ্ধাবসানে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, শিখদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধিবন্ধন হইল। এই সন্ধিসূত্রে রণজিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপসিংহ পঞ্জাবের সর্ব্ববাদিসম্মত অধিপতি হইলেন। বিপাশা ও শতদ্রুর অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ ইংরাজ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইল, শিখ সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল, মেজর (পরে সার্ হেন্‌রি) লরেন্স্ লাহোরের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজ্যে শান্তিসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে লাহোর দরবার এক দল ইংরাজ সৈন্য গ্রহণ করিলেন।

কাশ্মীর রাজ্যের সূত্রপাত।—এই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লাহোর দরবারের নিকট দেড় কোটি টাকা দাবী করিলেন। লাহোর দরবারের অত টাকা দিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন লাহোরের তদানীন্তন মন্ত্রী রাজা গোলাব সিংহ সেই টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কাশ্মীর প্রদেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে বর্ত্তমান কাশ্মীর রাজ্যের সূত্রপাত হইল।

সার্ হেন্‌রি হার্ডিং এই যুদ্ধের পর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশযাত্রা করিলেন। তাঁহার পর লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন।

বিংশ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড ডাল্‌হৌসী।

লর্ড ডাল্‌হৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আট বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে ডাল্‌হৌসির ৩৬ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে আর কেহ গবর্ণর-জেনারল হন নাই। ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল হইবার পূর্ব্বে লর্ড ডাল্‌হৌসী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল সাহেবের

লর্ড ডালহৌসী।

অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল লর্ড হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং লর্ড হেষ্টিংস ভারতবর্ষের শাসন-

প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা উপদেশ প্রদান করেন। সে সময় হেষ্টিংস ডালহৌসীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তখন হইতে সাত বৎসর কাল যুদ্ধবিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংসের ভবিষ্যৎবাণী কার্য্যে পরিণত হইল না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডালহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। সেই বৎসরেই তাঁহাকে শিখদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল।

শিখদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ।—মূলরাজ মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার নিকট লাহোর দরবারের প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দরবার তাঁহার নিকট এই টাকা চাওয়াতে তিনি বলিলেন যে, তিনি পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, টাকা দিতে পারিবেন না। তখন লাহোরের ইংরাজ রেসিডেণ্ট একজন নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাকে মূলতানে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা মূলতানে পৌঁছিলে মূলরাজের সৈন্যগণ সেই ইংরাজ কর্ম্মচারিদ্বয়কে হত্যা করিল এবং মূলরাজ বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই সময়ে এডোয়ার্ডেস্ নামক একজন ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারী ঘটনাস্থল হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র কতিপয় সৈন্য লইয়া মূলতানে উপস্থিত হইলেন এবং মূলরাজকে দুই তিনটী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে মূলতান দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহ সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল এবং ছত্রসিংহ, সেরসিংহ প্রভৃতি শিখ সর্দ্দারগণ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিলেন।

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গবর্ণর জেনারলের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু শিখদিগের ব্যবহারে তিনি অগত্যা উঁহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা

করিতে বাধ্য হইলেন, এবং প্রধান সেনাপতি গফ্ শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইংরাজ সৈন্যগণ প্রথমেই মুলতান গ্রহণ করিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে চিলিন্ওয়ালা নামক স্থানে এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল। চিলিন্ওয়ালার যুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ সেরসিংহ শিখদিগের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পক্ষে ২৪০০ সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু কোন পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পারা যায় নাই। সে যাহা হউক, চিলিন্ওয়ালার যুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে তথাকার কর্ত্তৃপক্ষগণ সার চার্লস্ নেপিয়রকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নূতন সেনাপতি পৌছিবার পূর্ব্বেই সেনাপতি গফ্ গুজরাটের যুদ্ধে শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯)।

অতঃপর ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ তারিখে লর্ড ডাল্হৌসী ইংলণ্ডেশ্বরীর নামে সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করিলেন। রণজিৎসিংহের পুত্র মহারাজ দলীপসিংহ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। বৃটিশ শাসন গুণেই অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্জাবের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধিত হইল। পঞ্জাবের অধিবাসিগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল; এমন কি, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে শিখেরা তদানীন্তন প্রধান কমিসনর জন লরেন্সের অধীনে থাকিয়া ও বিদ্রোহদমনে সাহায্য করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অটল ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। পঞ্জাবগ্রহণের তিন বৎসর পরেই এক দল শিখসৈন্য দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিয়াছিল।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ।—ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারিগণ রেঙ্গুনবন্দরে সর্ব্বদাই ইংরাজবণিক ও জাহাজের কাপ্তেনদিগের উপর অত্যাচার করিত। এই অত্যাচার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কমোডোর ল্যাম্বার্ট ১৮৫২

খ্রীষ্টাব্দে জলপথে রেঙ্গুনে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মদেশীয়েরা পূর্ব্ববৎ এবারেও ইংরাজদিগের সহিত অতিশয় কুব্যবহার করিল। কাজেকাজেই লর্ড ডাল্‌হৌসী ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্য অল্পদিন মধ্যেই রেঙ্গুন হইতে প্রোমনগর পর্য্যন্ত ইরাবতীর উভয়তীরবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিল। ব্রহ্মরাজ সন্ধি করিতে অসম্মত হওয়াতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সমগ্র পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমে ইংরাজের অধীনে পেগু-রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইল।

অপুত্রক সামন্ত-রাজের রাজ্য গ্রহণ।—লর্ড ওয়েলেস্‌লি করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যেরূপ সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ওয়েলেস্‌লির ভারতবর্ষ ত্যাগের পর ক্রমে সেই ব্যবস্থার অনেক দোষ দেখা গেল। ওয়েলেস্‌লির প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থানুসারে যে সকল রাজা ইংরাজরাজের সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তাঁহারা যদি সন্ধির নিয়মগুলি যথাযথরূপে পালন করেন তাহা হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সকল প্রকার শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। রাজগণের পক্ষে কেবল এই অঙ্গীকার করিতে হইয়াছিল যে তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে স্থাপিত ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিবেন না, কিংবা কোন বৈদেশিককে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন না। কিন্তু স্বীয় রাজ্যের সুশাসন করিতে হইবে, প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না, করিলে রাজ্যচ্যুত হইবেন, তাহাতে এরূপ কোন সর্ত্ত ছিল না। ফলে অনেক রাজা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছিলেন।

ইঁহাদের অত্যাচারে প্রজাগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। লর্ড ডাল্‌হৌসী দেশীয় রাজ্যগুলির এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন যে এগুলিকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন না করিতে পারিলে কোন মতেই মঙ্গল নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন দেশীয় রাজ্যের রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, তাঁহার রাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত করা হইবে। রাজার যদি কোন দত্তকপুত্র থাকেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না, কেবল রাজার নিজস্ব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন। এই ব্যবস্থা লর্ড ডাল্‌হৌসীর নিজের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা নহে। ইতঃপূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে এ ব্যবস্থা মত কার্য্যও হইয়াছিল। যাহা হউক এই ব্যবস্থানুসারে লর্ড ডাল্‌হৌসী সর্ব্বপ্রথমে সাতারারাজ্য গ্রহণ করিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পেশোয়া বাজী-রাওকে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত করিয়া মাকুইস অব্ হেষ্টিংস্ শিবাজীর অন্যতম বংশধরকে সাতারার সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারার রাজার মৃত্যু হয়। নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে রাজা দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডাল্‌হৌসী উক্ত দত্তকপুত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া সাতারারাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঝাঁসি ও নাগপুর রাজ্য গৃহীত হইল। এই উভয় রাজ্যের রাজারাও নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তর গমন করেন, এবং ডাল্‌হৌসী সাতারার ন্যায় এই উভয় রাজ্যও গ্রহণ করেন। এইরূপে জৈৎপুর, সম্বলপুর, বাগহাট প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র রাজ্য গৃহীত হয়।

অন্যান্য প্রকারে রাজ্য গ্রহণ।—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বেরার প্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীনে আসিল। নিজাম নিজরাজ্যে সংস্থাপিত

ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় যোগাইতে না পারিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট ঋণী হইয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য তিনি বেরার প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা গৃহীত হয়। অযোধ্যার নবাবগণ ক্লাইবের সময় হইতে চিরকালই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা পুরুষানুক্রমে বিলাসপরায়ণ হওয়াতে ইঁহাদের শাসনে রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক ও হার্ডিং অযোধ্যার নবাবকে অনেকবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাল্‌হৌসী ডিরেক্টর-সভার অনুমতিক্রমে সমগ্র অযোধ্যারাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া কলিকাতার সন্নিহিত মেটেবুরুজ নামক স্থানে বাস করিলেন।

বৃত্তি ও উপাধি লোপ।—কয়েকজন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ অপুত্রক মরিলে তাঁহার দত্তক পুত্র বৃত্তি পাইবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ডাল্‌হৌসী রাজ্যের অনেক ব্যয় লাঘব করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পেশোয়া বাজীরাওয়ের মৃত্যু হয়। তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা করিয়া বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দত্তক পুত্র ধুন্ধুপন্থ (নানাসাহেব)কে আর বৃত্তি দিলেন না। ইহার কিছু পরে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজা পরলোকগমন করায় তাঁহাদেরও বৃত্তি ও উপাধি বিলুপ্ত হইল।

কোম্পানির শেষ সনন্দ।—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন; ইহাই তাঁহাদের শেষ সনন্দ। কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই সনন্দ দেওয়া হইল না। যতদিন পার্লামেণ্ট মহাসভা ইচ্ছা করিবেন কেবল ততদিন

কোম্পানি ভারত শাসন করিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এই সনন্দের নির্দ্দেশ অনুসারে বাঙ্গালায় একজন লেফ্‌টেনান্ট-গবর্ণর নিয়োজিত হইলেন। সিভিলসার্ভিসে ডিরেক্টরদিগের যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহা উঠিয়া গেল ও তৎপরিবর্ত্তে পরীক্ষা দ্বারা যোগ্যতা অনুসারে লোক লইবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে ভারতবাসীর উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবার পথ আরও প্রশস্ত হইল।

দেশের নানাবিধ উন্নতি।—ডাল্‌হৌসী যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ রাজ্যবিস্তার লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে। রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি-

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সাধনের জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে তিনি ভারতে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তন করিয়া যান। তাঁহারই উৎসাহে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই চেষ্টায় সাধারণ পূর্ত্ত-কার্য্যের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমশঃ বড় বড় রাজপথ খাল প্রভৃতি

প্রস্তুত হইতে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গার খাল তাঁহারই সময়ে প্রথম খোলা হয়। ডাল্‌হৌসীর সময়ে ডাকবিভাগের বিশেষ উন্নতিসাধিত হয়। এই সময়ে দুই পয়সা মাসুলে চিঠির চলাচল আরম্ভ হয়। লোহিতসাগরের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডে জাহাজ চালাইবার পক্ষে লর্ড ডাল্‌হৌসী অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ডাল্‌হৌসী সাধারণ শিক্ষাকার্য্যেরও অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার উৎসাহে এবং বিটন্ সাহেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মার যত্নে কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হইতে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের তদানীন্তন সভাপতি

সার চাল্‌স্ উড্ তাঁহার প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিষয়ক মন্তব্য প্রেরণ করেন এবং ডাল্‌হৌসী শিক্ষা-বিভাগ গঠন করিয়া তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করিবার

ব্যবস্থা করেন। এই মন্তব্য অনুসারেই পরে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিদ্যালয় সমূহে সরকারী সাহায্য-দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাল্‌হৌসী স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এদেশে প্রায় আট বৎসরকাল অনবরত গুরুতর পরিশ্রম করাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডে ফিরিয়া তিনি আর অধিকদিন বাঁচেন নাই। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

একবিংশ অধ্যায়।

—:o:—

লর্ড ক্যানিং।

লর্ড ডাল্‌হৌসীর পর তাঁহার বন্ধু ও সহাধ্যায়ী লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হন। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পদত্যাগ-পূর্ব্বক স্বদেশযাত্রা করেন। সুতরাং লর্ড ক্যানিং ঠিক ৬ বৎসরকাল ভারতের গবর্ণর-জেনারলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালে সুপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। লর্ড ক্যানিংএর ধৈর্য্য কার্য্যদক্ষতা ও মনের বল, এবং তাঁহার সেনাপতিদিগের রণনৈপুণ্যবশতঃ শীঘ্রই বিদ্রোহদমন হয়, এবং সর্ব্বত্র শান্তিসংস্থাপিত হইবার পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তদবধি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের খাস দখলে রহিয়াছে, এবং ইংলণ্ডের মন্ত্রিদলভুক্ত একজন সেক্রেটরি অর্থাৎ

প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও তদীয় কাউন্সিল দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসিত হইতেছে। সিপাহীবিদ্রোহ ও মহারাণী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের শাসনভারগ্রহণ এই দুইটীই লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা।

লর্ড ক্যানিং।

সিপাহীবিদ্রোহের কারণ।—লর্ড ডালহৌসীর ভারত-শাসনকালেই ভারতক্ষেত্রে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং এদেশে আসিবার পরেই উহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইবার পর স্বদেশ হইতে বিদায়গ্রহণ করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা, আমার শাসনকালে ভারতবর্ষে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত না হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অধুনা প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান রহিয়াছে ইহাও যথার্থ বটে, কিন্তু কে জানে কখন ভারতাকাশে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘ উদিত হইয়া ক্রমে

সমগ্র ভারতবর্ষকে ঘোর বাত্যা ও ঝঞ্ঝাবাতে আচ্ছন্ন না করিবে।" লর্ড ক্যানিংএর এই বাক্যটী এখন ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যগ্রহণ ও নানাসাহেব প্রভৃতির বৃত্তিলোপ সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ইংরাজীশিক্ষা প্রভৃতির প্রবর্ত্তন বশতঃ অশিক্ষিত ভারত-বাসীর মনে এই ধারণা হয় যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই হিন্দু ও মুসল-মানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন; বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও কেহ পৈত্রিক ধন হইতে বঞ্চিত হইবে না, হিন্দু-বিধবার বিবাহ বিধি-সঙ্গত, এবং প্রয়োজন হইলে হিন্দু সিপাহীকেও সমুদ্র পার হইতে হইবে, তখন তাহাদের হৃদয়ে উক্ত কুসংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া গেল এবং অবশেষে মূর্খ সিপাহীরা জাতি-নাশ ভয়ে বিদ্রোহী হইল; আবার পক্ষান্তরে লর্ড লরেন্স ও তাঁহার মতাবলম্বিগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে,চর্ব্বিমিশ্রিত টোটাকাটার জনরবই বিদ্রোহের একমাত্র কারণ। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, একটী কারণে এই ভয়ানক বিদ্রোহের সংঘটন হয় নাই কতকগুলি কারণ সমবায়ে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। তবে টোটাকাটার জনরবকেই এই বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির সিপাহীদিগের মধ্যে নূতন রাইফল বন্দুক প্রবর্ত্তিত হয়। এই বন্দুকের টোটায় গরুর ও শূকরের চর্ব্বি আছে বলিয়া সিপাহীদিগের মধ্যে একটী কুসংস্কার প্রবল হইয়া উঠে। গবর্ণমেণ্ট সিপাহীদিগের হস্তে এই টোটা দেওয়াতে উহাদের সংস্কার হয় যে, কোম্পানি বাহাদুর হিন্দু ও মুসলমান উভয়

জাতিরই ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই কারণে সিপাহীরা টোটা কাটিতে অসম্মত হয়। লর্ড ক্যানিং সিপাহীদিগের সমক্ষে পরীক্ষা করাইয়া দেখান যে, টোটাতে কোন প্রকার দূষণীয় পদার্থ নাই। কিন্তু তখন সিপাহীদিগের মন বিগড়াইয়া গিয়াছিল, সুতরাং গবর্ণর-জেনারলের সদুপদেশ সিপাহীদিগের অন্তঃকরণে স্থান পাইল না। ইহার উপর সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য লোকেরও অভাব ছিল না। যাঁহাদিগকে ডাল্‌হৌসী রাজ্যচ্যুত বা বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর স্বভাবতঃই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন এই সময় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্য প্রদেশে রাজস্ব সম্বন্ধে যে বন্দোবস্ত হইতেছিল, তাহাতে অনেক লোকের লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করাতে অনেকের তালুকদারী স্বত্বে আঘাত লাগিয়াছিল। যাহারা এইরূপে বা অন্য কোনরূপে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজদের পতন কামনা করিতেছিল এবং এই সুযোগে নানা মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া সিপাহীদের অসন্তোষ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। এই সময়ে ভারতবর্ষে সিপাহীসৈন্যের সংখ্যা গোরা ফৌজের সংখ্যার সাতগুণ ছিল; সুতরাং সিপাহীদের এই ভ্রম জন্মিল যে, তাহারা অনায়াসেই ইংরাজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিতে পারিবে। বিশেষতঃ দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব একশত বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়, সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির রাজত্বকাল একশত বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এই সকল কারণে সিপাহীরা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে চাঞ্চল্য দাবাগ্নির ন্যায় ভারতের অনেক অংশেই বিস্তৃত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর সহজে উহা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিদ্রোহের সূত্রপাত।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বারাকপুর নামক স্থানে কোম্পানির সেনানিবেশ বা ছাউনী ছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে এই বারাকপুরের ছাউনিতে সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গেল, সেখানে মধ্যে মধ্যে ঘরে আগুন লাগিতে আরম্ভ করিল। ইহার এক মাস পরে বহরমপুরে একদল সিপাহী টোটা কাটিতে অস্বীকার করাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য বারাকপুরে লইয়া আসা হইল। তাহাদের বারাকপুরে পৌঁছিবার দুই দিন পূর্ব্বে মঙ্গল পাঁড়ে নামক একজন সিপাহী ভাঙ্ খাইয়া উন্মত্ত হইয়া একজন সেনানায়ককে গুলি করিল এবং অন্য সিপাহীগণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিল। ইংরাজ সেনাপতি বিচার করিয়া মঙ্গল পাঁড়েকে ফাঁসী দিলেন ও বহরমপুরের সিপাহীরা বারাকপুরে পৌঁছিলে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এইরূপে আপাততঃ বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু এই সকল ব্যাপারের গল্প যখন নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পৌঁছিল, তখন সেখানে বিদ্রোহাগ্নি ভয়ানক ভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মীরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহ।—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তথাকার ইংরাজদিগকে হত্যা করিল, এবং তাহার পর দিল্লীতে আসিয়া তথাকার সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিল। দিল্লীর সিপাহীরাও মীরাটওয়ালাদের ন্যায় বিদ্রোহী হইয়া যত পারিল ইংরাজ হত্যা করিল এবং দিল্লীর বৃদ্ধ বাদসাহ বাহাদুর সাকে ভারতের বাদসাহ বলিয়া প্রচার করিয়া সকলকে তাহাদের সহিত যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিল। অতঃপর বাদসাহের নামেই বিদ্রোহীদিগের কার্য্য-কলাপ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এলাহাবাদ হইতে শতদ্রু নদীর তীর পর্য্যন্ত স্থানে বিদ্রোহাগ্নি পরিব্যাপ্ত হইল, এবং চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া দিল্লীর বিদ্রোহীদিগের দলপুষ্টি করিতে লাগিল।
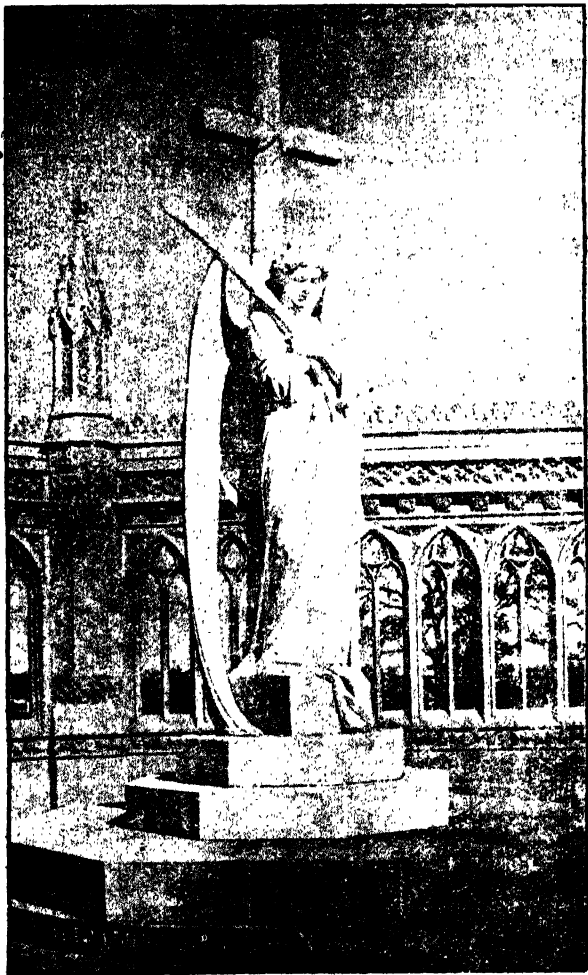
কাণপুর মেমোরিয়েল ওয়েল।

কাণপুরে বিদ্রোহ।—মে মাসে মীরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। ইহার পর জুন মাসে কাণপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও কাণপুরের নিকট বিঠুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর লর্ড ডাল্‌হৌসী বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের পৈত্রিক বৃত্তি লোপ করেন, তাহা তোমরা জান। এই সময়ে নানাসাহেব সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলেন ও পেশোয়া উপাধি গ্রহণ করিলেন। কাণপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর বাদসাহের সহিত মিলিত হইবার জন্য দিল্লী যাইতে ছিল। নানাসাহেব হিন্দু সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করিবার আশা দিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে হস্তগত করিলেন। কাণপুরে অনেক ইউরোপীয় স্ত্রী পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা ২০ দিন পর্য্যন্ত নানা কষ্টে পড়িয়াও আত্মরক্ষা করিলেন। কিন্তু অবশেষে অন্নাভাবে তাঁহাদিগকে নানাসাহেবের শরণাপন্ন হইতে হইল। নানাসাহেব তাঁহাদিগকে নৌকাযোগে এলাহাবাদে পৌঁছাইয়া দিবার আশা দিলেন। কিন্তু তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজ স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকাগণ নৌকায় আরোহণ করিবামাত্র বিদ্রোহীরা তাঁহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। ফলে পুরুষদিগের অধিকাংশই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, এবং স্ত্রী ও শিশুগণ বন্দী হইলেন (২৭শে জুন)। ১৫ই জুলাই তারিখে সেনাপতি সার হেন্‌রি হেব্‌লক কাণপুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হেব্‌লক আসিবার সময়ে পথে নানাসাহেবের সৈন্যদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন শুনিয়া নানাসাহেব ইংরাজ বন্দিগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া উহাদের মৃতদেহ সমূহ একটী কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সে কূপটী অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। পরদিন সেনাপতি হেব্‌লক কাণপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নানাসাহেবকে পরাজিত করিলেন। নানাসাহেব সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সপরিবারে পলায়ন করিলেন। তদবধি তাঁহার আর কোন্‌ সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অযোধ্যায় বিদ্রোহ।—অযোধ্যার চীফ্ কমিশনর সার্ হেন্‌রি লরেন্স্ অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বাবধি সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি সমুদয় ইউ-রোপীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্ণৌ নগরের সুরক্ষিত রেসিডেন্সিতে রহিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তথায় ৪ঠা জুলাই তারিখে গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি হেব্‌লক ও আউট্রাম্ লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সার কলিন ক্যাম্বেল (পরে লর্ড ক্লাইভ্) সসৈন্যে আসিয়া লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিলেন।

দিল্লীর পুনরুদ্ধার।—জুন মাসে সার হেন্‌রি বার্ণার্ড দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদিগের কিয়দংশকে পরাজিত করিলেন এবং আগষ্ট মাসে নিকল্‌সন্ পঞ্জাব হইতে আসিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী অব-রোধপূর্ব্বক তথাকার বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন। দিল্লীর পুন-রুদ্ধারের সহিত সিপাহীবিদ্রোহের মূলচ্ছেদ হইল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বীর নিকল্‌সন সমরশায়ী হইলেন। অতঃপর বাদসাহ বাহাদুর সাকে সামান্য বৃত্তি দিয়া রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত করা হইল। এই সময়ে বাদসাহের দুইটী পুত্র গুলির আঘাতে নিহত হইলেন।

মধ্য-ভারতে বিদ্রোহ।—মধ্যভারতে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়াতোপী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সার হিউ রোজ বোম্বাই হইতে অগ্রসর হইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁতিয়াতোপী কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া অব-শেষে ধরা পড়িলেন, এবং তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যগণও বিদ্রোহী হইয়াছিল। ক্রমে তাহাদিগের দমন হইল।

বিহারে বিদ্রোহ।—বিহারে আরা জেলার অন্যতম জমিদার

কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আরার অন্তর্গত জগদীশপুর গ্রামে কুমারসিংহের বাস ছিল। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহে কাহারা যোগদান করিয়াছিল।—উপরে বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলির কথা বলা হইল। ইহা হইতেই বিদ্রোহ কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা অনুমান করিয়া লইতে পার। এই বিদ্রোহ সিপাহীদেরই বিদ্রোহ; ইংরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট কয়েকজন রাজা, জমিদার ও অন্যান্য ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের সহিত ইহার বড় সম্পর্ক ছিল না। সকল সিপাহীও ইহাতে যোগ দেয় নাই। বিদ্রোহের সময় বোম্বাই ও মান্দ্রাজের দেশীয় সৈন্যগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিল। হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার সালার জঙ্গ অনেক চেষ্টা করিয়া নিজামের সৈন্যদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন। পঞ্জাবের শিখ সৈন্যেরা মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিত, সুতরাং তাহারা দিল্লীর বাদশাহের সংস্রবে যায় নাই। এতদ্ভিন্ন সার জন লরেন্সের বুদ্ধিকৌশলে তাহারা বশে ছিল। লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের সময় নেপালের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাদুর সৈন্যপ্রেরণপূর্ব্বক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বহস্তে রাজ্যগ্রহণ।—বিদ্রোহ নিবারণের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আয়ুঃশেষ হইল। পার্লামেণ্ট সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারত-শাসনের গুরুভার এক বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে রাখা আর কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং দৈবজ্ঞগণের ভবিষ্যদ্বাণী একরূপ সফল হইয়াছিল বলিতে হইবে।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্রোল উঠিয়া গেল ও 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামক এক নূতন সভা গঠিত হইল। স্থির হইল যে, এই সভার পরামর্শ গ্রহণ

করিয়া মহারাণীর একজন 'সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট্' বা মন্ত্রী ভারতশাসন করিবেন। গবর্ণর-জেনারল রাজ-প্রতিনিধি ভাবে সেক্রেটরি অব্-ষ্টেটের উপদেশানুসারে ভারতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর তারিখে লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ নগরে দরবার করিয়া এই ঘোষণা পত্র পাঠ করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া

মহারাণীর ঘোষণাপত্র।

মহারাণীর এই ঘোষণাপত্র আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। ইহা "ভারতবাসীর মহাসনন্দ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাকে বর্ত্তমান ভারতবাসীর সকল রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। উক্ত ঘোষণায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতীয় রাজা প্রজাগণকে অভয় দিয়া, ধর্ম্ম ও জাতি নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে রাজ্যশাসন করিবার যে অঙ্গীকার করেন তাহা স্তোক বাক্যমাত্র নহে। মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারের পর হইতে ক্রমশঃই এদেশে শাসনকার্য্যে উদারনীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, এবং উহার ফলে ভারতে প্রজাসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি, শিক্ষার উন্নতি ও উচ্চ পদলাভ প্রভৃতি অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত ঘোষণাপত্রের সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

"জগদীশ্বরের অনুগ্রহে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড রাজ্যের এবং তদধীন

উপনিবেশ ও অন্যান্য দেশসমূহের অধীশ্বরী আমি শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া নানা কারণ বশতঃ পার্লামেণ্ট মহাসভার পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, অদ্য হইতে আমি এই শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলাম। ভারতীয় প্রজাবর্গ যেন অদ্যাবধি আমার ও আমার উত্তরাধিকারীদিগের প্রতি সমুচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করে এবং আমরা যে সকল শাসনকর্তা নিযুক্ত করিব যেন তাঁহাদের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকে।

ভাইকাউণ্ট ক্যানিং মহোদয় আমার বিশেষ আত্মীয় এবং বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্র; তাঁহার যোগ্যতা, দক্ষতা, রাজভক্তি ও সুবিবেচনায় আমার যথেষ্ট আস্থা আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাকে আমি আমার প্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারলের পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমার একজন সেক্রেটরি অব্ ষ্টেটের নির্দ্দেশ অনুসারে আমার নামে ও আমার হিতার্থে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজগণের সহিত এ পর্য্যন্ত যে সকল সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি তাহা অব্যাহত রাখিব। আশা করি, রাজারাও সেই সকল সন্ধিপত্রে লিখিত সর্ত্ত মত কার্য্য করিবেন।

আমি রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাহি না। অন্যে আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব, কিন্তু অন্যের স্বত্ব আমি আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিব না। দেশীয় রাজগণের স্বত্ব ও মর্য্যাদা আমি নিজের স্বত্ব ও মর্য্যাদার ন্যায় রক্ষা করিব। শান্তি ও সুশাসন ভিন্ন দেশের সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি হয় না। আশা করি ভারতীয় রাজা ও প্রজাগণ এবিষয়ে যত্নবান হইবেন।

আমার অন্য দেশীয় প্রজাবর্গের প্রতি আমার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিও আমি সেই সকল কর্ত্তব্য যত্ন-সহকারে পালন করিব।

খ্রীষ্টধর্ম্মে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; কিন্তু প্রজাবর্গকে বলপূর্ব্বক এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করাইতে আমার অধিকার বা প্রবৃত্তি নাই। আমি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছি যে, ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য কেহ নিগ্রহ বা অনুগ্রহ-ভাজন হইবে না। আমার কর্ম্মচারিগণকে আমি আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা যেন কাহারও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপের উপর হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইব।

আমার আরও ইচ্ছা এই যে আমার প্রজারা যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, তাহারা অবাধে ও বিনা পক্ষপাতে স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতানুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

পৈতৃক ভূসম্পত্তির উপর ভারতবাসীর যে বিশেষ মমতা আছে তাহা আমি জানি। এ বিষয়ে রাজার প্রাপ্য বাদে তাহাদের সকল স্বত্ব রক্ষিত হইবে। আমার ইচ্ছা এই যে, আইন প্রণয়ন ও বিচারকালে প্রাচীন রীতিনীতি ও স্বত্বাদির উপর যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে।

কতিপয় দুরাকাঙ্খ লোক মিথ্যা রটনার সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ ঘটাইয়া যে অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। আমি এই বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজশক্তির পরিচয় দিয়াছি। যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ কুপথে চালিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্যপথে ফিরিয়া আসিতে চায়, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া এখন আমার দয়ার পরিচয় দিবার অবসর হইয়াছে। যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল তাহাদিগকে ভিন্ন আর সকল বিদ্রোহীকে আমি ক্ষমা করিলাম। প্রজা-হত্যাকারীদিগকে ক্ষমা করা ন্যায়বিরুদ্ধ।

আমি কেবল ভারতবাসীদের হিতার্থই ভারতের শাসনকার্য্য পরি-

চালনা করিব। জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে যখন দেশের অভ্যন্তরে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইবে, তখন আমি যথাসাধ্য শিল্পের উন্নতিবিধান ও লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। ভারতীয় প্রজাগণ সমৃদ্ধিশালী হইলে আমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহারা সন্তুষ্ট থাকিলে আমি নিরাপদ হইব এবং তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া জ্ঞান করিব। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে ও আমার কর্ম্মচারিবৃন্দকে এই প্রজাহিতকর অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করেন।"

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

—:o:—

রাজপ্রতিনিধিগণের ভারত শাসন।

লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর লর্ড ক্যানিং প্রথম রাজ-প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ক্যানিং মহারাণীর ঘোষণা পত্রের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজগণকে জানাইলেন যে অতঃপর তাঁহাদের ঔরসজাত পুত্রের অভাবে দত্তক পুত্র রাজা হইতে পারিবেন।

নানাবিধ সংস্কার।—ক্যানিংএর আমলে কয়েকটী উৎকৃষ্ট আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের অত্যাচার হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য খাজনা আইন, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি, এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী কার্য্যবিধি ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি প্রচলিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভায়

বে-সরকারী দেশীয় ও ইউরোপীয় সভ্যেরা প্রথম প্রবেশাধিকার পান। পর বৎসর সুপ্রীমকোর্ট ও সদর আদালতদ্বয় একত্র করিয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের জন্য রাজ্যের অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। এজন্য ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ জেম্‌স্ উইল্‌সন্ সাহেব রাজস্ব-মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসিলেন ও রাজস্ব বৃদ্ধির নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্কের সংস্কার সাধন, লাইসেন্স ট্যাক্স ও ইন্‌কম ট্যাক্সের প্রবর্ত্তন ও কারেন্সি নোটের প্রচলন করেন।

লর্ড এল্‌গিন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে লর্ড এল্‌গিন্ গবর্ণর জেনারল ও রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে লর্ড এল্‌গিন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের দূত হইয়া চীনদেশে গিয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে তিনি ভারতবর্ষের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকসভায় তিন জন ভারতবাসী সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আগ্রায় একটী প্রকাণ্ড দরবার করেন। এই দরবারে রাজপুতানা ও অন্যান্য প্রদেশের রাজাদিগের নিমন্ত্রণ হয়। এইটীই লর্ড এল্‌গিনের শেষ কার্য্য। তিনি ইহার পর অধিক দিন কার্য্য করিতে পারেন নাই। ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর হিমালয় প্রদেশের অন্তর্গত ধর্ম্মশালানামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল।

লর্ড লরেন্স্।

লর্ড এল্‌গিনের মৃত্যু হইলে সার জন্ লরেন্স্ ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল ও রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার ভারতে পৌঁছাইতে

যতদিন বিলম্ব হইল, ততদিন মান্দ্রাজের গবর্ণর সার উইলিয়ম্ ডেনিসন্ গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করিলেন। সার জন্ লরেন্স্ সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে পঞ্জাবের চীফ কমিশনর ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই শিখসৈন্য সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদিগের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। সার্ জন্ অতি উপযুক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথমে আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রমে এখন গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। এরূপ পদোন্নতি বোধ হয় অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

সিতানা বিদ্রোহ।—লরেন্স্ গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবের প্রান্তে অবস্থিত সিতানা নামক স্থানের মুসলমান অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া অন্যান্য আফ্গান জাতিকে তাহাদের সহকারী হইবার জন্য আহ্বান করে। ক্রমে বিদ্রোহ গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা হয়। পঞ্জাবের সমুদয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই সময়ে গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলে সহজেই বিদ্রোহ নিবারণ হইতে পারে, এই ভাবিয়া ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ লর্ড এল্গিনের মৃত্যুর পর সার জন্ লরেন্স্কেই ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল নিযুক্ত করেন। সার জন্ লরেন্স্ ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই প্রধান সেনাপতি সার হিউ রোজ্কে উল্লিখিত বিদ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সার হিউ রোজ্ অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন করিলেন।

ভুটান দেশের সহিত যুদ্ধ।—হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশে ভুটান রাজ্য অবস্থিত। ভুটান রাজ্যের সহিত যুদ্ধ সার জন্ লরেন্সের শাসনকালের প্রধান ঘটনা। সার জন্ লরেন্সের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্ব হইতে ভুটানরাজ্যের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিবাদ চলিতেছিল। যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আসাম প্রদেশ গ্রহণ করেন, সেই

সময়ে আসামের পার্ব্বত্য প্রদেশের নিম্নে অবস্থিত দোয়ার নামক স্থান ভূটান রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া ভূটানদেশের রাজার নিকট হইতে এই স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি ভূটিয়ারা এ অঞ্চলে আসিয়া নানা অত্যাচার করিত। কথন কথন বিনা-কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইতেও ত্রুটি করিত না। অবশেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়া ভূটানরাজের প্রাপ্য টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি ও সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সার আস্‌লি ইডেন্ সাহেবকে ভূটানরাজ্যের রাজধানীতে দূতস্বরূপে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সার আস্‌লি ইডেনের দৌত্যে সুফল ফলিল না। ভূটিয়ারা সার আস্‌লিকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া দুয়ার প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইল। সুতরাং সার জন্ লরেন্স্ বাধ্য হইয়া ভূটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৮৬৪)। এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল, এবং অবশেষে দুয়ার প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল, কিন্তু ভূটানরাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিবার ব্যবস্থা হইল।

উড়িষ্যাপ্রদেশের দুর্ভিক্ষ।—সার জন্ লরেন্সের শাসনকালে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যাপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রদেশে বৃষ্টির অভাবে অজন্মা হইয়াছিল। এই জন্য ক্রমে ধান চাউল মহার্ঘ এবং পরে একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই সময়ে উড়িষ্যাপ্রদেশে রেলওয়ে হয় নাই। সুতরাং তৎকালে দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে শস্য আমদানী করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। এই সময়ে সার সেসিল্ বীডন্ বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর ছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু

তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছিল। যাহারা কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়াছিল, তাহাদের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। এই দুর্ভিক্ষের ফলে, গবর্ণমেণ্ট ভাল রাস্তা-নির্ম্মাণ, খাল-খনন প্রভৃতি দ্বারা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য বিশেষ যত্নবান হন, এবং সার জন্ লরেন্স্ কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থ খাল খনন করাইবার জন্য এক স্বতন্ত্র পূর্ত্তবিভাগ স্থাপন করেন।

সার জন্ লরেন্সের উদাসীন রাজনীতি।—১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের আমীর দোস্ত মোহম্মদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থা করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সের আলি আমীর হইবেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত হইল না। আমীরের মৃত্যুর পর তাঁহার অপর দুই পুত্র আফ্জল খাঁ ও আজিম খাঁ সের আলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল, এবং অবশেষে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সের আলির জয় হইল। ভ্রাতৃবিরোধের সময়ে সের আলি সার জন্ লরেন্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর-জেনারল এই বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন যে, তিনি কোন পক্ষেরই সাহায্য করিবেন না, যে পক্ষ জয়লাভ করিবেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করিবেন। সের আলি অবশ্যই গবর্ণর-জেনারলের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সার জন্ লরেন্স্ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন, এবং লর্ড মেয়ো তাঁহার পদে গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। দেশে ফিরিবার পর সার জন্ লরেন্স্ লর্ড উপাধি পাইলেন।

লর্ড মেয়ো।

আম্বালা দরবার।—নূতন নিযুক্ত গবর্ণর-জেনারল লর্ড মেয়ো

ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই পঞ্জাবের অন্তর্গত আম্বালা নগরীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করিলেন। এই দরবারে সের আলিকে আফগানিস্তানের আমীর বলিয়া স্বীকার করা হইল।

লর্ড মেয়ো।

রাজপুত্রের আগমন।—১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র আলফ্রেড, ডিউক অব্ এডিন্‌বরা, ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। তাঁহার আগমনে ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশের লোকেই আন্তরিক রাজভক্তি প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে।

নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্য।—লর্ড মেয়ো প্রজাহিতৈষী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি প্রজাদের উপকারার্থ শাসনকার্য্যের নানা বিভাগের নানা উন্নতিসাধন করেন। তিনি কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কৃষিবিভাগ নামক ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটী নূতন বিভাগ সংস্থাপন

করেন। তিনি ভারত সাম্রাজ্যের নানাস্থানে রেলওয়ে, খাল, রাজপথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রজার মহোপকার সাধন করেন, এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিসাধন করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন।

আয়ব্যয় সংস্কার।—লর্ড মেয়ো এদেশে আসিবার পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যের ব্যয় আয় অপেক্ষা বেশী হইতেছিল। লর্ড মেয়ো রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া, সেনা ও পূর্ত্তকার্য্যের ব্যয় কমাইয়া এবং ইন্‌কম ট্যাক্স ও লবণ কর বর্দ্ধিত করিয়া আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিলেন। পূর্ব্বে ভারতের সমস্ত রাজস্ব ভারত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা হইত। বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের ব্যয়ের জন্য যে টাকা আবশ্যক হইত, তাহা তাঁহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতি বৎসর চাহিয়া লইতেন এবং ব্যয়ের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা ভারত গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিতেন। সুতরাং আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় সংকোচ করিয়া প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ হইত না। আর ব্যয় বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতাও ছিল না, নিজের ইচ্ছামত প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহারা ব্যয় করিতে পারিতেন না, এমন কি ৫৲ টাকা বেতনে একজন সামান্য ভৃত্য নিযুক্ত করিতে হইলেও তাঁহাদিগকে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইত। অথচ ভারত গবর্ণমেণ্ট সকল সময় তাঁহাদের প্রয়োজন মত অর্থ দিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় হ্রাসের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন না। সেইজন্য লর্ড মেয়ো এই ব্যবস্থা করিলেন যে অতঃপর প্রত্যেক প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট রাজকরের নির্দ্দিষ্ট অংশ স্বেচ্ছামত ব্যয় করিতে দেওয়া হইবে। যদি তাঁহারা এই রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন বা ব্যয় সংকোচ করিয়া কিছু অর্থ বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত অর্থ তাঁহারা স্বেচ্ছামত স্ব স্ব প্রদেশের হিতার্থ ব্যয় করিতে পারি-

বেন। লর্ড মেয়োর এই ব্যবস্থার দ্বারা স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর এক প্রকার সূত্রপাত হয় বলিতে হইবে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো আণ্ডামান দ্বীপে পোর্ট ব্লেয়ার নামক স্থানে কয়েদীদিগকে দেখিতে যান। তথায় সের আলি নামক একজন মুসলমান ছুরী মারিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করে। তাঁহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর পর লর্ড নর্থব্রুক্‌ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

লর্ড নর্থব্রুক্‌।

বিহার প্রদেশের দুর্ভিক্ষ।—১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিহার প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। লর্ড নর্থব্রুক্‌ ব্রহ্মদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ চাউল আনাইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রজাদিগের মধ্যে অকাতরে বিতরণ করিলেন এবং বিহারের নানাস্থানে সাধারণ হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই সকল কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া অনেক নিরন্ন ব্যক্তি জীবিকা উপার্জ্জন পূর্ব্বক নিজ নিজ জীবন রক্ষা করিল। লর্ড নর্থব্রুক্‌ এইরূপে প্রাণপণে দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইলেন।

যুবরাজের ভারতবর্ষ পরিদর্শন।—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্‌ সপ্তম এডওয়ার্ড তৎকালে যুবরাজ ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন। যুবরাজকে সাদরে ও ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভারতের সকল স্থানেই এরূপ উদ্যোগ হইয়াছিল যে, উহার সমান পূর্ব্বে আর কখনই দেখা যায় নাই।

বরোদার গায়কবাড়ের রাজ্যচ্যুতি।—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গায়কবাড় মলহররাও তথাকার রেসিডেণ্ট সাহেবকে বিষপ্রয়োগ-দ্বারা হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। লর্ড নর্থব্রুক্‌ তাঁহার বিচারের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনে

তিনজন দেশীয় রাজা ও তিনজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ছিলেন। কমিশনের বিচারে গায়কবাড় দোষী স্থির হইলে, গবর্ণর-জেনারল তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া গায়কবাড়-বংশীয় একটী বালককে রাজত্ব প্রদান করেন।

লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হওয়াতে তিনি ইন্‌কম্ টেক্স অর্থাৎ আয়কর উঠাইয়া দেন। ফলতঃ লর্ড নর্থব্রুকের সুশাসনে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতবর্ষের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

লর্ড লিটন্।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। লর্ড লিটনের পিতা একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। লর্ড লিটন্ নিজেও সুকবি ও রাজনীতিবিশারদ ছিলেন।

লর্ড লিটন।

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের "রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের সম্মান বর্দ্ধন করিলেন। এই শুভকার্য্য উপলক্ষে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে লর্ড লিটন্ দিল্লী নগরীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করিলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের রাজা মহারাজা নিমন্ত্রিত হইলেন। সকলের সমক্ষে রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন্ এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিলেন। সেইদিন হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রজাসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্টতর হইল।

মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ।—কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত শুভকার্য্যের বৎসরেই মান্দ্রাজ প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য লর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইল না। এই ভয়ানক দুর্ভিক্ষে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আফগান যুদ্ধ।—আফগানিস্তানের আমীর সের আলি সার জন্ লরেন্সের সময় হইতেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ বেলুচিস্তানের অন্তর্গত কোয়েটা নগর গ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক শত্রুর আগমন-নিবারণ উদ্দেশ্যে তথায় এক সেনানিবেশ সংস্থাপিত হয়। আমীর এই কার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এই জন্য সের আলি রুসিয়ার সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রুসিয়া সাম্রাজ্যের একজন দূত কাবুলে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। লর্ড লিটন্ আমীরের ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া প্রতিবিধানের জন্য তাঁহার নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু আমীরের লোক সে

দূতকে তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অপ-মানিত হইয়া আফ্‌গানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের জয় হইল। অল্প-দিনের মধ্যেই জেলালাবাদ ও কান্দাহার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল। সের আলি বল্‌খপ্রদেশের অন্তর্গত মাদারীসরিফ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। এই স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। পর বৎসর সের আলির পুত্র য়াকুব খাঁ সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। গণ্ডামাক নামক স্থানে উভয় পক্ষের সন্ধি হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট য়াকুব খাঁকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং য়াকুব খাঁ তাঁহার রাজধানী কাবুলে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবার অনুমতি দিলেন। সার লুই কাবানারি কাবুলের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু কাবুলের অধিবাসীরা ইংরাজ রেসিডেণ্টের নিয়োগে অসন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। কাবুলীদিগের বিশ্বাসঘাতকায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার যুদ্ধঘোষণা করিলেন। এইটী আফ্‌গানিস্তানের সহিত তৃতীয় যুদ্ধ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার ফ্রেডরিক রবার্টস্ (পরে বিখ্যাত লর্ড রবার্ট্‌স্) এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া কাবুলে উপস্থিত হই-লেন। কাবুল তাঁহার হস্তগত হইল। আমীর য়াকুব খাঁ বন্দীকৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলেন। এই ঘটনার পর সমগ্র আফ্‌গানিস্তান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল। ঠিক এই সময়েই ইংলণ্ডে মন্ত্রিদলের পরিবর্ত্তন হওয়াতে লর্ড লিটন্ পদত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড রিপণ্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন [১৮৮০]।

লর্ড রিপণ্।

লর্ড রিপণের আগমনকালে আফ্‌গানিস্তানে যুদ্ধ চলিতেছিল। য়াকুব খাঁর ভ্রাতা আয়ুব খাঁ এই সময়ে হিরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। আয়ুব খাঁ

কান্দাহারের দিকে অগ্রসর হইয়া মাইওয়াণ্ড নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। প্রধান সেনাপতি রবার্টস্ এই সংবাদ শ্রবণে সত্বর কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া আয়ুব খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৮৮০)। ইহার পর লর্ড রিপণের আদেশে সের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আবদর রহমানকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজ সৈন্য ভারতে ফিরিয়া আসিল।

লর্ড রিপণ্।

লর্ড রিপণের সংস্কারাবলী।—লর্ড রিপণ্ ভারতবর্ষের পরম-হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। আফ্‌গান যুদ্ধের পর তিনি যে কয় বৎসর ভারত-বর্ষের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, নানাবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপণ্ লিটনের প্রবর্ত্তিত মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন রদ করিয়া প্রজাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। অতঃপর দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকগণ স্বাধীনভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের দোষগুণ বিচার করিতে সমর্থ হইলেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র স্বায়ত্তশাসন প্রণালী সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড রিপণ্ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যেক জেলায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সংস্থাপন করিলেন। জেলার মহকুমা সমূহেও স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইল, এবং বোর্ড সমূহের উপর জেলা ও মহকুমা সমূহের নানাকার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। বোর্ডের মেম্বরদিগের অধিকাংশই প্রজাদিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা হইল। এই সঙ্গে মিউনিসিপালিটী সমূহেও করদাতারা মিউনিসিপাল সভার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলেন। ফলতঃ স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া লর্ড রিপণ ভারতবর্ষের যে মহোপকার করিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কোন গবর্ণর-জেনারলই তাহা করেন নাই।

অতঃপর লর্ড রিপণ্ ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের সুশিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য এক শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত করিলেন, এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতিবিধান ও উৎসাহ প্রদানার্থ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এক বৃহৎ শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিলেন। অধুনা যে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন অনুসারে জমিদার ও প্রজার পরস্পর বিবাদের বিচার হইয়া থাকে, এবং যাহা বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রজাদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সেই প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইন প্রজাহিতৈষী লর্ড রিপণেরই কার্য্য। আইনটী তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারল লর্ড ডফরিণের শাসনকালে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে জমিদার প্রজার নিকট অন্যায়-রূপে কর আদায় করিতে পারেন না।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপণের কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে।

লর্ড ডফরিণ্।

লর্ড রিপণের পর লর্ড ডফরিণ্ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

রাউলপিণ্ডির দরবার।—ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লর্ড ডফরিণ্ পঞ্জাবের অন্তর্গত রাউলপিণ্ডি নগরে একটী প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করিয়া তথায় আমীর আবদর রহমনকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পর আমীর ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পরস্পর সদ্ভাব বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমীরের বার্ষিক বৃত্তি বাড়াইয়া দিলেন।

আফগানিস্তানের সীমানির্দ্ধারণ।—লর্ড ডফরিণের শাসনকালের প্রারম্ভে রুসিয়ার জার আফ্গানিস্তানের দিকে রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে রুসিয়া রাজ্য হইতে হিরাট আক্রমণের জন্য চেষ্টা হয়। হিরাট হস্তগত করিতে পারিলেই আফ্গানিস্তান গ্রহণের বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ হিরাট আফ্গানিস্তানের দ্বার স্বরূপ। লর্ড ডফরিণ্ সুদক্ষ রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, রুসিয়া হিরাট গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এই জন্য তিনি আফ্গানিস্তানের সীমানির্দ্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে রুসিয়ার সহিত একযোগে একটী কমিশন গঠিত করিলেন। কমিশনে রুস ও ইংরাজ উভয় পক্ষের সদস্য নিযুক্ত হইলেন। সার পিটর লম্স্‌ডেন কমিশনের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। সীমান্তস্থিত কোন কোন স্থানের অধিকার সম্বন্ধে রুসিয়া ও আফ্গানিস্তানের মধ্যে মতভেদ হইল। পরিশেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমীর বিবাদী স্থানসমূহের উপর নিজের দাবী পরিত্যাগ করিলেন, রুসিয়াও হিরাট গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। এইরূপে ইংলণ্ড ও রুসিয়ার পরস্পর বিবাদের সম্ভাবনা নিবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সামন্তরাজগণ রুসিয়ার সহিত যুদ্ধের আশঙ্কায় নিজ নিজ সৈন্য দ্বারা চক্রবর্ত্তী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সহায়তা

করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের এই অযাচিত দানে প্রীত হইয়া সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক তখন সে সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় নাই।

তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ।—কিছুদিন হইতে ব্রহ্মদেশে ভয়ানক গোলযোগ চলিতেছিল। ব্রহ্মরাজ থিবো অপদার্থ রাজা ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মরাজের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তিনি সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাচার করিতেন। ব্রহ্মদেশের লোকেরা তৎকালে ইংরাজ ব্যবসাদারদিগের জিনিসপত্র সর্ব্বদাই লুট করিয়া লইত। লর্ড ডফরিণ্ এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার জন্য থিবোর নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু থিবো গবর্ণর-জেনারলের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে হইল না, বিনাযুদ্ধে থিবোর রাজধানী মাণ্ডালে নগর ইংরাজ সেনাপতির হস্তগত হইল। থিবো বন্দীকৃত ও ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইলেন এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল (১৮৮৬)।

গোয়ালিয়র দুর্গ প্রত্যর্পণ।—এই বৎসরেই লর্ড ডফরিণ্ গোয়ালিয়রের দুর্গ মহারাজ সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সার হিউ রোজ্ গোয়ালিয়রের দুর্গ গ্রহণ করেন। সেই অবধি উহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত ছিল। এখন লর্ড ডফরিণ্ উহা সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করাতে, কেবল যে সিন্ধিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞ হইলেন এরূপ নহে, ভারতবর্ষের যাবতীয় সামন্ত-রাজাই গবর্ণমেণ্টের এই দয়ার কার্য্যে পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

জুবিলী।—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিল। এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে মহাসমারোহে 'জুবিলী' উৎসব সম্পন্ন হইল এবং ভারতবর্ষের আপামর সাধারণ সকল প্রজাই অশেষ প্রকারে রাজভক্তি প্রকাশ করিল।

দেশীয় কৃতবিদ্যগণ যাহাতে উচ্চতর রাজকার্য্য পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য লর্ড ডফরিণের পরামর্শ মতে একটী কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের নিষ্পত্তি অনুসারে দেশীয়গণের অনেক উচ্চতর রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইয়াছে। লর্ড ডফরিণের সহধর্ম্মিণীর চেষ্টায় এদেশের অন্তঃপুরচারিণীগণের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এগুলি "লেডী ডফরিণ্‌ হাঁসপাতাল" নামে পরিচিত।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডফরিণ্‌ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্‌ তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন।

লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্‌।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণ।—লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্‌ শাসনভার গ্রহণ করিয়াই ভারতসাম্রাজ্যের উত্তর-সীমা নিরাপদ করিবার জন্য তথায় সৈন্য সংস্থাপনের বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন; এই সময়ে কাবুলের আমীরের সহিত এক নূতন সন্ধি হইল এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতের গিরিবর্ত্মগুলির দ্বারস্বরূপ চিত্রলনামক স্থানটী কাবুলের আমীর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মণিপুর যুদ্ধ।—এই সময়ে মণিপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ এই গোলযোগের মূল কারণ ছিলেন। এই জন্য আসামের চীফ কমিশনর টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিয়া গোলযোগ মিটাইবার জন্য মণিপুরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু টীকেন্দ্রজিতের উত্তেজনায়, চীফ কমিশনর কুইন্‌টন্‌ সাহেব ও তাঁহার চারিজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নিহত হইলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল মণিপুরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সামান্য যুদ্ধের পর ইংরাজ সৈন্য মণিপুর অধিকার করিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য রাজাকে আণ্ডামান্‌ দ্বীপে নির্ব্বাসিত করিয়া ঐ বংশের এক জন

বালককে সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীর ও সেনাপতি টীকেন্দ্রজিতের প্রাণদণ্ড হইল।

স্বায়ত্ত-শাসন প্রণালীর বিস্তার।—এই বৎসরেই ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির সম্বন্ধে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যসংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থা হইল, এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ও মিউনিসিপ্যালিটী সমূহকে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সভ্য নির্ব্বাচন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। এই আইনের বলে ব্যবস্থাপক সভার বে সরকারী সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্‌।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্‌ ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহার পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাজ প্রতিনিধি লর্ড এল্‌গিনের পুত্র দ্বিতীয় লর্ড এল্‌গিন্‌ গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষে নানাবিধ দুর্ঘটনা হয়। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরীতে ভয়ানক প্লেগ উপস্থিত হয়, এবং অসংখ্য লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ভয়ানক মহামারী অধুনা ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশেই বিস্তৃত হইয়াছে, এবং প্রতিবৎসর বহুলোকের এই রোগে অকালমৃত্যু হইতেছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয় এবং বিহার, আগ্রা ও অযোধ্যা, বোম্বাই, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় ও বিদেশীয় বহু ব্যক্তি এই ঘোর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য সমবেত চেষ্টা করিয়া অনেক লোকের জীবনরক্ষা করেন।

লর্ড এল্‌গিনের শাসনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফ্রিদি ও অন্যান্য জাতিরা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে। এই

গোলযোগ নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করেন, এবং গোলযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব ৬০ বৎসর অতিক্রম করে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের সকল অংশেই আনন্দোৎসব হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলগিন স্বদেশে প্রতিগমন করেন, এবং লর্ড কার্জ্জন্ তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

লর্ড কার্জ্জন্।

দুর্ভিক্ষ।—লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালের প্রারম্ভেই মধ্যপ্রদেশ, বেরার, গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ

লর্ড কার্জ্জন্।

উপস্থিত হইল। এরূপ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষে বহুকাল অবধি দেখা যায় নাই। লর্ড কার্জ্জন্ যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া এই দুর্ভিক্ষের উপশম করিলেন ও ভবিষ্যতে যাহাতে দুর্ভিক্ষ না হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত করিলেন এবং কৃষকগণকে জল সরবরাহ করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে কূপ খাল প্রভৃতি খননের ব্যবস্থা করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু।—১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি তারিখে ইংরাজ সাম্রাজ্যের মহাবিপদ উপস্থিত হইল। ঐ দিবস মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে শোকসাগরে ভাসাইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মহারাণী দেবতার ন্যায় পূতচরিত্রা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ যেন মাতৃহীন হইল। মহারাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সপ্তম এড্ওয়ার্ড্ ইংলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন।
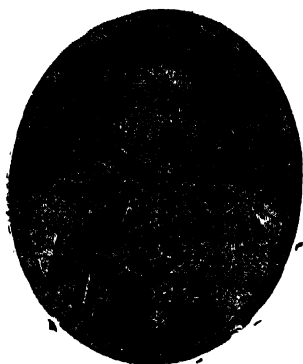
সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড্।

নূতন প্রদেশ গঠন।—আফ্রিদি প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহে সর্ব্বদা নানা উপদ্রব করে দেখিয়া, এবং লাহোর হইতে উহাদিগকে শাসনে রাখা কঠিন মনে করিয়া, লর্ড কার্জ্জন্ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটী নূতন প্রদেশ সংগঠন করিলেন। এই নূতন প্রদেশ একজন চীফ্ কমিশনের শাসনাধীন হইল।

লর্ড কার্জ্জনের আর একটী কার্য্য,—বাঙ্গালাদেশকে দুইটী স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা। অনেক দিন অবধি লর্ড কার্জ্জন্ ও অন্যান্য অনেকের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, সমগ্র বাঙ্গালা প্রদেশ একজন মাত্র লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণর কর্ত্তৃক সুশৃঙ্খলায় শাসিত হইতে পারে না। লর্ড কার্জ্জন এই অসুবিধা নিবারণের উদ্দেশ্যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সমগ্র আসাম লইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" নামে একটী নূতন প্রদেশ সংগঠন করিলেন। এই প্রদেশ একজন স্বতন্ত্র লেফ্টেনাণ্ট-গবর্ণরের শাসনাধীন হইল।

লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে হায়দরাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশটী নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি উহা হায়দরাবাদের ইংরাজ রেসিডেণ্টের শাসনাধীন ছিল। লর্ড কার্জ্জন্ নিজামের নিকট ঐ প্রদেশের চিরস্থায়ী পাট্টা লইয়া উহা মধ্য প্রদেশের শাসনাধীন করিলেন।

তিব্বতে অভিযান।—তিব্বত দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা "দলাই লামা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কার্জ্জনের সময় যিনি দলাইলামা ছিলেন, তিনি রুসিয়ার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গুপ্তমন্ত্রণা করিতেছেন শুনিয়া, তাহার প্রতিবিধান জন্য লর্ড কার্জ্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতে একদল সেনা প্রেরণ করেন। এই সেনাদল তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে উপস্থিত হইলে দলাইলামা পদত্যাগ করিয়া অপরের হস্তে রাজ্যভার দিতে বাধ্য হয়েন। পরে রুসিয়ার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, তিব্বত চীনদেশের অধীনে থাকিবে, তথায় রুসিয়ার কোনরূপ প্রাধান্য থাকিবে না।

নানাবিধ সংস্কার।—লর্ড কার্জ্জন্ এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তদুদ্দেশ্যে 'বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিভাগ' নামে ভারত গবর্ণমেণ্টের এক নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময়ে দেশের নানাস্থানে রেলওয়ের বিস্তার হয়। তিনি দেশীয় শিল্পের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন্ শিক্ষাসংস্কারের জন্যও বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য রাজকোষ হইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করেন, প্রাথমিক-শিক্ষা-প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নতির জন্য একটী নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি বিতরণ করিতেন। নূতন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-প্রণালী এক আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সমগ্র ভারতে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার একজন উচ্চরাজ-কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করেন।

লর্ড কার্জ্জন্ এদেশের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহার যত্নের ফলে হিন্দু মুসলমান আমলের অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

লর্ড কার্জ্জনের পদত্যাগ।—১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের কার্য্যভার ত্যাগের সময় হইলেও কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার দক্ষতায় প্রীত হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল আরও দুই বৎসর বাড়াইয়া দিলেন। যাহা হউক তিনি ছয় মাস ছুটি লইয়া বিলাত চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার স্থানে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড এম্প্ট্হিল্ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ছয় মাস পরে লর্ড কার্জ্জন্ ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন কার্য্য করিলেন না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার ভারতবর্ষের সমর-সচিবের পদ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলিলেন, প্রধান সেনাপতির হস্তেই সমর-সচিবের সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত থাকা উচিত। লর্ড কার্জ্জন্ লর্ড কিচেনারের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তদানীন্তন ষ্টেট্ সেক্রেটরি লর্ড কিচেনারের প্রস্তাবই যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া তাহা মঞ্জুর করিলেন। এই কারণে লর্ড কার্জ্জন্ পদত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড মিণ্টো তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন (১৯০৫)।

দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো।

দেশীয়গণের রাজকার্য্য সম্বন্ধে ক্ষমতা লাভ।—লর্ড মিণ্টো ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল লর্ড মিণ্টোর প্রপৌত্র। ইনি ভারতীয় প্রজাবর্গের বিশেষ হিতকামী ছিলেন। ইঁহার সময়ে এবং ইঁহার বিশেষ

চেষ্টায় এদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি নব গঠিত করিয়া তাহাতে অনেকগুলি বেসরকারী সভ্য লইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই সভ্যদের

দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো।

ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। ইঁহারই সময়ে গবর্ণর জেনারলের এক্সেকিউটিব কাউন্সিল বা শাসন পরিষদে একজন ও সেক্রেটারি অব ষ্টেটের কাউন্সিলে দুইজন দেশীয় সদস্য লইবার ব্যবস্থা হয়। সার সত্যপ্রসন্ন সিংহ (এক্ষণে যিনি লর্ড সিংহ) গবর্ণর-জেনারলের কাউন্সিলের এবং সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ বিলগ্রামী সাহেব সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের কাউন্সিলের প্রথম দেশীয় সভ্য। ঐ সঙ্গে সম্রাটের প্রিবি-কাউন্সিলেও ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার লাভ হইয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি আমীর আলি সাহেব এদেশীয়গণের মধ্যে প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

কাশীরাজের রাজক্ষমতা প্রাপ্তি।—লর্ড মিণ্টো আর একটী

কার্য্যে তাঁহার উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার সময় কাশীনরেশ নিজ জমিদারীর কিয়দংশে রাজ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সামন্তরাজগণের মধ্যে পরিগণিত হন। কাশীরাজের পূর্ব্বে রাজক্ষমতা ছিল। পরে চৈৎসিংহের বিদ্রোহের পর উহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং কাশী-নরেশ সামান্য জমিদার বলিয়া গণ্য হন। লর্ড মিণ্টো তাঁহাকে 'পুনরায় রাজক্ষমতা দেওয়াতে ভারতীয় হিন্দুগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সম্রাটের মৃত্যু। লর্ড মিণ্টোর কার্য্যকালের শেষভাগে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের পরম দয়ালু সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড্ রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ভারতবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্ব্বদাই যত্ন করিতেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়াছিল। সভ্যজগতে শান্তি-স্থাপনের জন্য তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ও নিরন্তর চেষ্টা ছিল, এই জন্য, তিনি'শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা' নামে অভিহিত হই-তেন। তাঁহার মৃত্যুতে জগতের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা সহজে পূরণ হই-বার নহে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্ মহা-মান্য পঞ্চম জর্জ্জ্ মহোদয় সিংহাসনারোহন করেন।

ইহার কিছুদিন পরেই মিণ্টো কার্য্যত্যাগ করিয়া বিলাতে গমন করেন ও ভূতপুর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল শিখবিজয়ী লর্ড হার্ডিংএর পৌত্র লর্ড হার্ডিং ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারলরূপে এদেশে আগমন করেন।

দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং।

সম্রাটের শুভাগমন।—লর্ড হার্ডিং ভারতে আসিবার কিছুকাল পরেই, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের শুভাগমন হয়। ইহার পূর্ব্বে গত সাতশত বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কোন নরপতিই ইউ-রোপ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই, বিশেষতঃ কোন সম্রাটই ইহার পূর্ব্বে বিলাত হইতে এদেশে আগমন করিয়া আমাদের সন্তোষবিধান

করেন নাই। সুতরাং তাঁহার এদেশে পদার্পণ ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যসূচক সন্দেহ নাই। তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসন-কালের প্রারম্ভে যুবরাজরূপে এখানে আসিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার

দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং।

অসীম দয়া ও সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া ভারতবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি তখন এদেশের লোকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগকে বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি সম্রাট্ হইলেন, তখন তিনি এদেশে তাঁহার অভিষেকের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার নিকট তাঁহার ইংরাজ প্রজা ও ভারতীয় প্রজা উভয়েই সমান।

দিল্লীর দরবার।—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সম্রাটের অভিষেকার্থে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই দরবারে ভারতীয় রাজগণ, উচ্চ কর্ম্মচারিগণ ও পদস্থ দেশীয়গণ সকলেই আমন্ত্রিত হইলেন। সেই দিন সম্রাট যে মঙ্গলবাণী প্রচার করিলেন, তাহা চির-স্মরণীয়। এদেশের প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি যে কত গভীর,
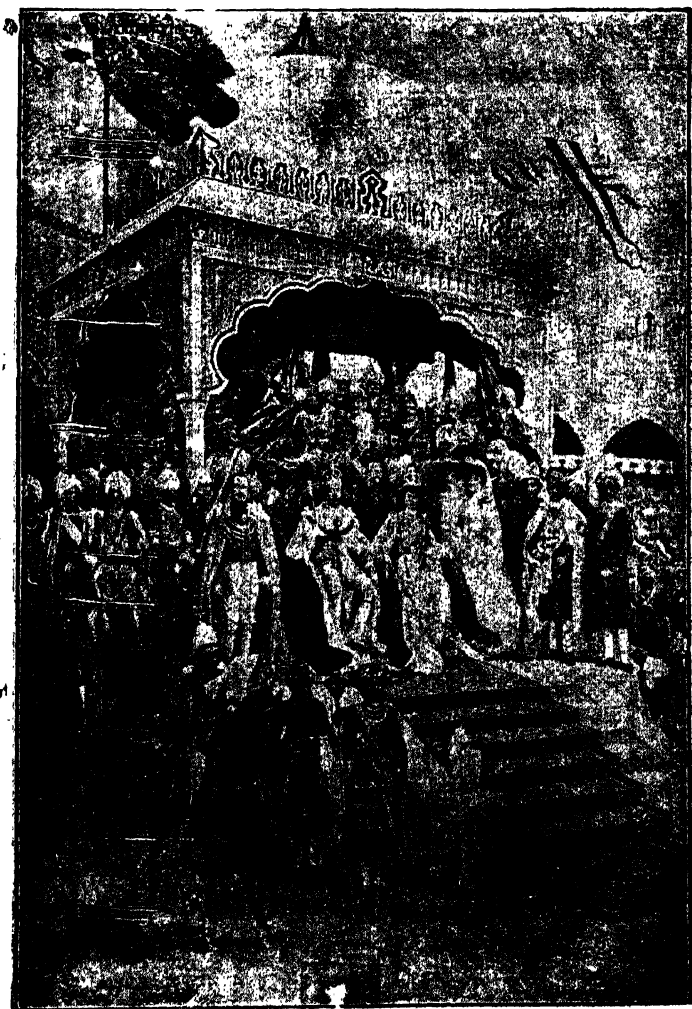
দিল্লীর দরবার।

তাহার পরিচয় তাঁহার ঘোষণাপত্রের প্রতি ছত্রে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সদাশয় সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ভারতীয় প্রজাবর্গের নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, মহামতি পঞ্চম জর্জ্জের ঘোষণাপত্রের দ্বারা সেগুলি দৃঢ়ীকৃত হইল। ঐদিন সম্রাটের আদেশে বিভক্ত বঙ্গদেশ আবার সম্মিলিত হইল এবং বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী নূতন প্রদেশ গঠিত হইল। আসামও আবার পূর্ব্বের স্থায় চিফ্ কমিশনারের অধীন হইল এবং বঙ্গদেশ শাসন করিবার জন্ম লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পরিবর্ত্তে গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্ম কলিকাতা নগরী হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল। দিল্লী ভারতের অতীত গৌরবের সহিত জড়িত। ঐস্থানে ভারতের রাজধানী পুনঃস্থাপিত হওয়ায় অনেকে সুখী হইল।

সম্রাট্ প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার কল্পে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, সেই দিন হইতে প্রাচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত মহামহোপাধ্যায় ও সামশুল-উলামা প্রভৃতি রাজসম্মানপ্রাপ্ত পণ্ডিতগণ রাজসরকার হইতে বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন। শিক্ষা ও বিদ্যোৎসাহ কল্পে এই দানের ফলে প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

দরবার উপলক্ষে সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। রাজাদেশে কারাগার হইতে অসংখ্য বন্দী মুক্ত হইল, বহু ঋণী ঋণমুক্ত হইল ও ভারতময় বালক বালিকা মিষ্টান্নাদি ভোজনে তৃপ্ত হইল। দেশময় সর্ব্বত্রই তাঁহার মঙ্গলগীতি গীত হইল এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত সম্রাটের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল।

জগদ্ব্যাপী মহাসমর।—সম্রাট্ বিলাতে প্রত্যাগমন করিবার দুই বৎসর পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে মহাসমরানল জ্বলিয়া উঠিল, এবং শীঘ্রই তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। আমাদের সম্রাট্ ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ অনেক চেষ্টা করিয়াও যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিলেন

না। বলদৃপ্ত জার্ম্মাণরাজ কৈসর উইলিয়ম বহুদিন ধরিয়া বলপূর্ব্বক ইউরোপের দুর্ব্বল জাতিদিগের রাজ্যগ্রাস করিবার কল্পনা করিয়া গোপনে সজ্জা করিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখন তিনি সামান্য একটী ছল ধরিয়া অষ্ট্রীয়ারাজের সহিত একযোগে রুসিয়া ও ফরাসী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (আগষ্ট ১৯১৪) এবং ফরাসী জাতিকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছায় নিরপেক্ষ, নির্দ্দোষ, দুর্ব্বল বেলজিয়ম রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করিলেন। ইংরাজরাজ চিরদিন দুর্ব্বলের সহায়। নিরপরাধ বেলজিয়ামের উপর এই অত্যাচার তাঁহার অসহ্য হইল এবং তিনি জার্ম্মাণ সম্রাটের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এই যুদ্ধে প্রথমে এক পক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, সার্ব্বিয়া, বেলজিয়ম, ইটালি, রুমেনিয়া ও জাপান এবং অপর পক্ষে জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া ছিলেন। পরে রুসিয়ার ভয়ানক অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় রুসিয়া ও রুমেনিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অপর দিকে আমেরিকা আমাদের মিত্রশক্তিগণের সহিত মিলিত হন। প্রায় সাড়ে চারি বৎসর কাল ভীষণভাবে এই যুদ্ধ চলিয়া ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নিবৃত্ত হয় এবং জার্ম্মাণী ও তৎপক্ষীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হন। তাঁহারা বিজয়ী পক্ষের ক্ষতিপূরণ করিতে ও তাঁহাদের অধিকৃত অনেক স্থান বিজেতৃ শক্তিবৃন্দকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার প্রজাবর্গ তাহাদের সম্রাটদ্বয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পুরাতন জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া ও তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ও অনেক অধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। যাহাতে পুনরায় কোন দুর্বৃত্ত জাতি এরূপভাবে জগতের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে, এক্ষণে তাহার জন্য বিজেতৃ শক্তিবৃন্দ চেষ্টা করিতেছেন।

এই যুদ্ধে ভারতের কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ধন প্রাণ অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই এদেশ হইতে বহু সৈন্য ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। তাহাদের অতুল বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়াছে এবং কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক বীরত্বের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজগণ সৈন্য ও ধন দিয়া সম্রাটের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অনেকে সসৈন্যে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে লর্ড হার্ডিং কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যুদ্ধ তখনও চলিতেছিল। এদেশে অবস্থান কালে হার্ডিং বাহাদুর অনেক মনস্তাপ পাইয়াছিলেন ও অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার দিল্লীতে কতিপয় পাপিষ্ঠ বোমা ফেলিয়া তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি বাঁচিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত হন। এত বিপদে ও মনঃক্ষোভেও হার্ডিং সাহেবের দয়া, সদাশয়তা ও ভারতবাসীর প্রতি ভালবাসা কমে নাই। তিনি প্রজা সাধারণের উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তার কল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌।

লর্ড হার্ডিংএর পর লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড্‌ ভারতের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে কয়েকটী স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, মহাসমর-কালে ইঁহারই অনুগ্রহে বাঙ্গালীগণ সেনাদলে প্রবেশাধিকার লাভ করে, এবং একদল বাঙ্গালী সেনা সংগঠিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। তদ্ভিন্ন ইঁহারই পরামর্শে ও বিলাতের মন্ত্রিবর্গের উদারতার ফলে আমাদের দেশের দুইজন প্রধান ব্যক্তি ভারতের প্রতিনিধিরূপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'যুদ্ধ পরি-

চালন-সমিতি'তে প্রেরিত হন। এই দুই জনের মধ্যে একজন বিকানীরের মহারাজ, অপর ব্যক্তি বাঙ্গালী,—আমাদের সত্যপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়। যুদ্ধান্তে সন্ধিসর্ত্তসমূহ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ফরাসীদেশে যে 'শান্তি সমিতি'র অধিবেশন হইয়াছিল—যেখানে ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী প্রভৃতি জগতের প্রধান শক্তিবৃন্দ মিলিত হইয়া জগতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ণয় করিয়াছিলেন—সেখানেও ভারতের এই প্রতিনিধিগণ স্থান পাইয়াছিলেন।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড্।

ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এতদ্ভিন্ন বিলাতের মন্ত্রিদলে উক্ত সিংহ মহাশয় সহকারী ভারতসচিবের আসন লাভ করেন এবং মহাসম্মানসূচক লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। ইংরাজ-শাসনকালে

ভারতবাসীর ভাগ্যে এত উচ্চ পদ ও সম্মান লাভ আর কখনও ঘটে নাই।

লর্ড সিংহ।

শাসনতন্ত্রের সংস্কার।—যাহাতে ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রথা অধিকতর প্রসার লাভ করিতে পারে এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীনদেশের ন্যায় ক্রমশঃ এদেশেও যাহাতে শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের মতানুসারে পরিচালিত হয়, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এতদুদ্দেশ্যে বিলাত হইতে ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব মণ্টেগু মহোদয় স্বয়ং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বড়লাট চেম্‌স্‌ফোর্ড মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতের শাসনতন্ত্র-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব

গুলি গত ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে পার্লামেণ্ট ও সম্রাট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে যে, অতঃপর আমাদের ব্যবস্থাপক সভা গুলিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য অপেক্ষা জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অনেক অধিক হইবে। সুতরাং এই সকল সভায় দেশের লোকের মত অধিকতর প্রবল হইবে। তদ্ভিন্ন শাসনতন্ত্রের কয়েকটী বিভাগ জনসাধারণ হইতে নির্ব্বাচিত দেশীয় মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে দেশের শাসনভার কতক পরিমাণে ভারতবাসীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছে, এবং কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তাহাদের এই অধিকার ক্রমশঃ আরও বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ আশা দেওয়া হইয়াছে।

এই আইন অনুমোদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশয় সম্রাট্ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "অদ্য হইতে ভারত-শাসনের এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। যেদিন হইতে ভারতের ভার আমাদের এই রাজবংশের উপর ন্যস্ত হইয়াছ, সেই দিন হইতে এই বংশের সকল রাজাই ঐ দেশের মঙ্গলসাধন তাঁহাদের পবিত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্য আমার পিতামহী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসিগণকে তাঁহার অন্যান্য প্রজাগণের সহিত সমভাবে পালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এবং আমার পিতা সম্রাট এড্ওয়ার্ডও তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আমিও আমার অভিষেক কালে বলিয়াছিলাম যে, ভারতের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা আমার জীবনের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা হইবে। এই সকল প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমরা কার্য্য করিতে সতত প্রয়াস পাইয়াছি এবং ভগবৎ কৃপায় আমরা যে সকল বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছি, ভারতবাসীকে যথাসম্ভব সেই সকলের অংশভাগী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু একটী সামগ্রী তাহা-

দিগকে দিতে এখনও বাকী আছে,—তাহা তাহাদের দেশের আভ্যন্তর শাসনদণ্ড পরিচালনের পূর্ণ অধিকার। কিন্তু এই গুরুভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা দ্বারা শক্তি আহরণ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান আইনে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীদিগের সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ হইবে,—ইহা তাহাদের পূর্ণ-দায়িত্ব-বিশিষ্ট শাসনভার লাভের প্রথম সোপান। এই পথে ভারতবাসিগণ কিরূপ উন্নতিলাভ করে, তাহা আমি ঔৎসুক্য ও সহানুভূতি সহকারে দেখিব। আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিবার জন্য অধ্যবসায়, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রাণতা প্রভৃতি যে সকল মহোচ্চ গুণের প্রয়োজন, ভারতবাসীর মধ্যে তাহার অভাব হইবে না। আশা করি আমার কর্ম্মচারীরা ও যে সকল জননায়ক ভবিষ্যতে মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিবেন এবং ভারতবাসিগণ যাহাতে ক্রমশঃ তাহাদের অভীপ্সিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গুলি লাভ করিতে পারে তৎপক্ষে সাহায্য করিবেন। ব্রিটিশাধিকৃত ভারতের শাসন-পদ্ধতি সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে আমি ভারতের দেশীয় রাজগণের একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে অনুমতি দিয়াছি। আমার আশা আছে, এই সমিতি সৎপরামর্শ দ্বারা দেশীয় রাজ্যগুলির ও সেই সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যের কল্যাণসাধন করিবেন।”

লর্ড রেডিং।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের কার্য্যকাল ফুরাইলে আমাদের বর্ত্তমান বড়লাট লর্ড রেডিং তাঁহার স্থানে গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি জাতিতে য়ীহুদি এবং সামান্য অবস্থা হইতে কেবল নিজের প্রতিভাবলে এত উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান যুবরাজের ভারতবর্ষে আগমন, ইঁহার শাসনকালের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

—:o:—

ইংরাজ শাসনের সুফল।

দেড়শত বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক বিস্ময়কর। প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, বহুশতাব্দীতে দেশের যে কল্যাণ সাধিত হয় নাই ইংরাজরাজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন।

পূর্ণশান্তি।—ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান সুফল,—পূর্ণ-শান্তি-স্থাপন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহারও শাসনকালে ভারত-বাসিগণ এরূপ শান্তিসুখ উপভোগ করে নাই। পূর্ব্বে ভারতে মধ্যে মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শান্তি সমগ্র দেশব্যাপী বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না, ভাগ্যক্রমে দেশের কোন অংশে শক্তিশালী সুশাসকের আবির্ভাব হইলে কেবল সেই অংশেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইত, এবং তাহার স্থিতিকাল সেই শাসকের জীবনের উপর নির্ভর করিত। এখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমানভাবে শান্তি বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আর সে হূণ নাই, শক নাই, সে তাইমুর, নাদির, আমেদসা নাই, সে বর্গী, পিণ্ডারি, ঠগ নাই। সামন্ত-রাজদিগের পরস্পর যুদ্ধে এখন আর দেশের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। ভারতের যেখানে যাও কোথাও আর দস্যুতস্করের ভয়ে শশব্যস্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে অনেক সুন্দর প্রদেশ বনে জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি শ্বাপদসমূহের আবাসভূমি হইয়াছিল। এখন ইংরাজের শাসনে সেই সকল স্থানই সুজল সুফল শস্যশ্যামল হইয়া ধনজন সমাকীর্ণ হইয়াছে। এখন আর দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার নাই।

কি রাজা, কি জমিদার কি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করিলে সকলেই দণ্ডনীয় হন। ফলে সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আত্মোন্নতিসাধনে মনোযোগী হইতে পারিয়াছেন।

সভ্যতার বিস্তার।—এহেন শান্তি ও শাসনের গুণে দেশের সর্ব্বত্র এই সভ্যতার প্রসার হইতেছে। গারো, কুকি, নাগা, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি পূর্ব্বে একরূপ উলঙ্গ থাকিত, নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিত, লুটপাট করিয়া দেশে অশান্তি উৎপাদন করিত, তাহারাও শাসনগুণে শিক্ষিত ও সভ্য হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্যাদি শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা জীবনধারণ করিতেছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসী হইয়াছেন। ফলে অনেক অসভ্যজাতীয় যুবক এখন কৃতবিদ্য হইতেছে।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউস্।

নূতন নগরাদি স্থাপন।—সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের

নানা স্থানে নূতন গ্রাম, নগর, স্বাস্থ্যাবাস, বন্দর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ত্তমান ভারতের যে তিনটী সহর সর্ব্বপ্রধান,—অর্থাৎ কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ,—ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। ইংরাজদিগের যত্নে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভাবে অতি সামান্য স্থান হইতে তাহারা এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়াছে। নগরাদি নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রদেশের জঙ্গল, জলা, প্রভৃতি পরিস্কার করিয়া উহাতে নূতন বস্তি নির্ম্মিত হইতেছে। তোমরা জান, আমাদের দেশে সুন্দরবন কিরূপ ব্যাঘ্র সর্পাদিসঙ্কুল ভীষণ স্থান। ইংরাজ রাজার যত্নে উহার উত্তরভাগের অনেকাংশই এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং উহাতে অনেক লোকের বাস হইয়াছে।

যাতায়াত, বাণিজ্য ও সংবাদ-প্রেরণাদির সুবিধা।—পূর্ব্বে দেশে ভাল রাস্তা ছিল না বলিলেই হয়। সময়ে সময়ে সদাশয় রাজারা যে সকল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, সেগুলি বৎসরের সকল সময় ব্যবহারোপযোগী হইত না। সাধারণতঃ কোন পুরাতন রাস্তার দুইধারে বৃক্ষ রোপণ করিয়া ও রাস্তার মধ্যে গর্ত্ত থাকিলে তাহা মাটি দিয়া বুজাইয়া এই সকল রাস্তা নির্ম্মিত হইত। রাস্তার মধ্যে নদী বা খাল পড়িলে তাহার উপর ভাল সেতু নির্ম্মাণ প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। বর্ষাকালে এই সকল রাস্তার যে কি ভয়ানক অবস্থা হইত, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কল্যাণে দেশের সর্ব্বত্র সুন্দর সুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথ এবং নদীগুলির উপর সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং যাতায়াত, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে আর সেরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নানাস্থানে বড় বড় খাল খনন করিয়া যেমন ব্যবসায় বাণিজ্য তেমনই চাষবাসের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বাংশেই এখন রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। রেলপথের দ্বারা লোকের যাতায়াত, মাল-প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে কত

সুবিধা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্রই টেলিগ্রাফের বিস্তার হইয়া উহার দ্বারা দূরদেশের খবর জানিতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভারত এখন পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের সহিত টেলিগ্রাফের দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভারতে বসিয়া প্রত্যহ পৃথিবীর

দার্জ্জিলিং রেলওয়ে।

সকল সংবাদ পাইয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র ষ্টীমার ও জাহাজের সাহায্যে আমরা সমস্ত জগতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিয়াছি। ডাকের সুব্যবস্থায় দেশের লোকের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। এখন অতি সামান্য খরচে সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা যায়। পূর্ব্বে এ সুবিধা ছিল না। মুসলমান রাজগণের আমলে ঘোড়ার ডাকছিল, তাহা দ্বারা বড় লোক ভিন্ন অন্ত কাহারও সুবিধা হইত না।
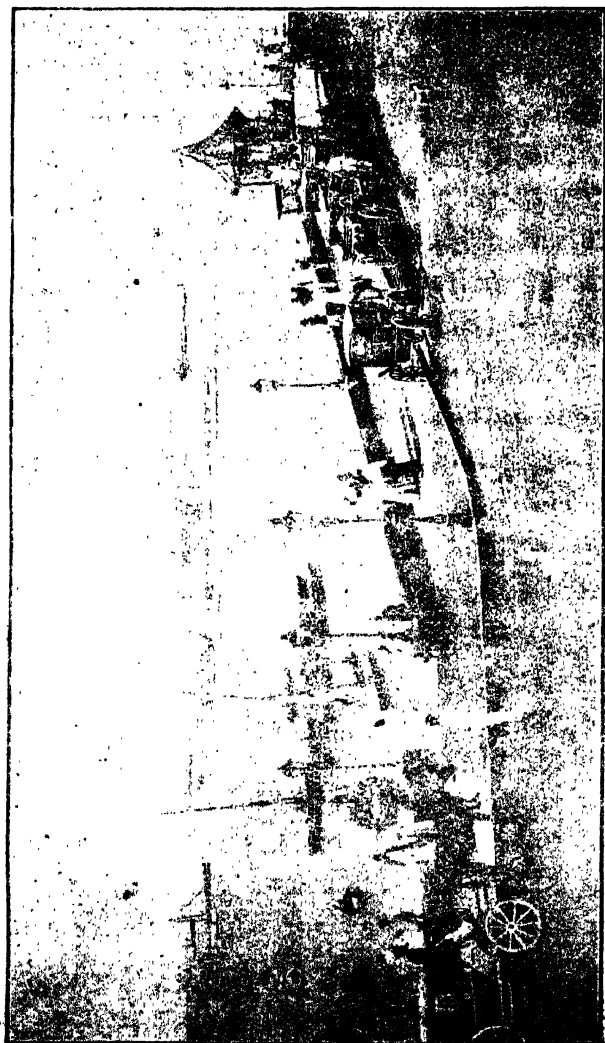
বোম্বাই এপোলো বন্দর।
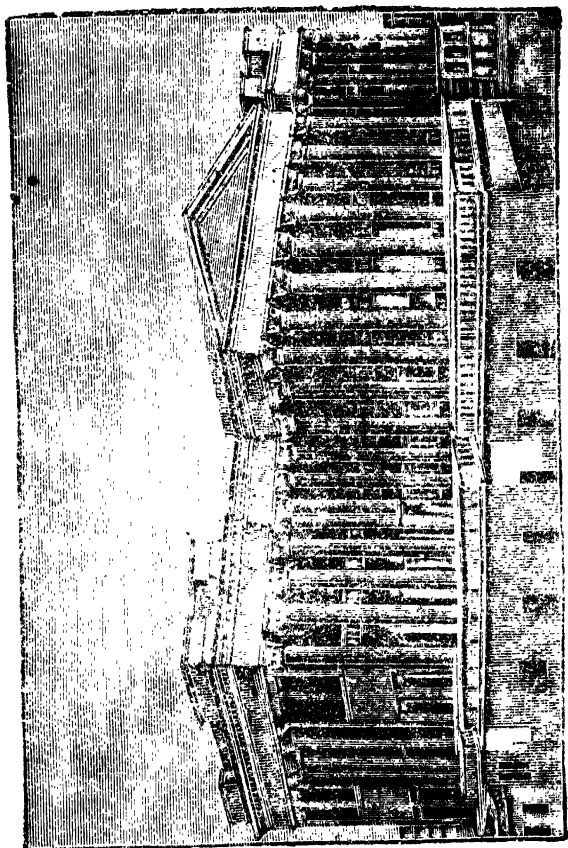
কলিকাতা মেডিকাল কলেজ

স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা।—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আমাদিগকে নানাবিধ ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা টিকা দিয়া বসন্ত রোগের হাত হইতে এবং জলনিকাশ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে সহরগুলিতে জলের কলের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং গ্রাম সমূহে অসংখ্য কূপ ও পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন

কেমন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা দেশবাসিগণকে নানা উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং যাহাতে মহামারীর সময়ে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রোগ চালিত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। রোগীর সেবার জন্য তাঁহারা সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অসংখ্য দাতব্য ঔষধালয় ও বড় বড় হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং অল্প মূল্যে কুইনিনাদি ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি।—শিল্প ও বাণিজ্য দেশে ধনাগমের প্রধান সহায়। ইংরাজের আমলে এ উভয়েরই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। দেশ কল কারখানায় ছাইয়া গিয়াছে এবং রেল ষ্টীমার প্রভৃতির সাহায্যে বাণিজ্য হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। এই সকল ব্যাপারে ইংরাজ ধনীরা কোটি কোটি টাকা এদেশে খাটাইতেছেন। ইহাতে স্বধু ইংরাজ বণিকেরা লাভবান হইতেছেন না, সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদেরও যথেষ্ট আর্থিক উন্নতি হইতেছে। ইংরাজের কল কারখানায় যাহারা কার্য্য করে, তাহাদের অধিকাংশই এদেশীয়। এতদ্ভিন্ন অনেক কারখানা দেশীয়দিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ইংরাজেরা কয়লার খনি প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া এদেশের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। কারখানা ও খনিগুলির প্রসাদে এদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ। সুতরাং কিসে কৃষকের কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে চলে তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, কি করিলে ফসল ভাল হয় তাহার উপদেশ কৃষিগণকে দিতেছেন, খাল কূপ প্রভৃতি খনন করিয়া তাহাদের ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেছেন। বিপদের সময় তাঁহারা দরিদ্র কৃষককে সাহায্যদান করেন, এবং তাহাদিগকে অল্পসুদে টাকা ধার দিবার জন্য, নানা স্থানে কৃষি-ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিব ক্রেডিট সোসাইটি বা সমবায়-ঋণদান-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।

দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত লোকদিগের আহারের ব্যবস্থা করেন এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশে নানা প্রকার পূর্ত্ত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে খাটাইয়া অর্থ ও খাদ্য দান করেন। দেশে রেল প্রভৃতির বিস্তার হওয়াতে এক্ষণে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থান সমূহে খাদ্য-শস্য পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

শিক্ষা বিস্তার।—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবর্ষে জনসাধারণের শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, সেরূপ পূর্ব্বে কখনই হয় নাই। পূর্ব্বে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোক প্রায় সকলেই অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উচ্চশ্রেণীর ন্যায় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকেও শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। দেশের প্রত্যেকে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এজন্য তাঁহারা প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে গবর্ণমেণ্ট এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা তোমরা জান। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের কত যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। অধুনা এলাহাবাদে, পঞ্জাবে, বারাণসীতে, পাটনায় ও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অনেকেই দেশের গৌরববৃদ্ধি ও সমাজের মঙ্গলসাধন করিতেছেন।

পূর্ব্বে এদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্যাদির চর্চ্চা করিতেন। জড়বিজ্ঞানের আলোচনা একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। শিল্পকার্য্য অশিক্ষিত লোকেই করিত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে

শিল্প শিক্ষা দিবার কোন বিদ্যালয় ছিল না। ফলে আমরা বিজ্ঞান শিল্প বিষয়ে অন্যান্য সভ্য জাতির তুলনায় অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন এদেশীয় লোকে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতেছে, নানাপ্রকার কলকব্জার নির্ম্মাণ প্রণালী জানিতেছে ও অশেষ প্রকারে নিজের উন্নতি করিতেছে। গবর্ণমেণ্টও এই কার্য্যে অনেক লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছেন।
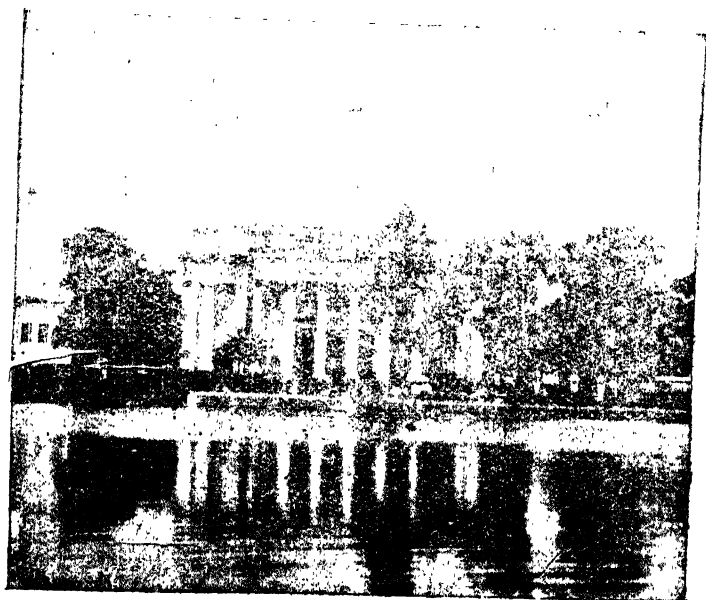
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

তাঁহারা বহুস্থলে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষালয়, কৃষি-বিদ্যালয়, বয়ন বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং ইউরোপে ও আমেরিকায় এই সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্য অনেক এদেশীয় ছাত্র পাঠাইয়া থাকেন।

শিক্ষিত লোকের উচ্চপদ প্রাপ্তি।—ভারতবাসিগণ জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব বিদ্যা বুদ্ধি ও দক্ষতা অনুসারে সকল রাজকার্য্যেই

নিযুক্ত হইতে পারিবেন, এ কথা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বারংবার আমাদিগকে বলিয়াছেন। মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এ অঙ্গীকার ভুলেন নাই। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকার কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন উপযুক্ত হইলে ভারতীয়-গণ, ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলাজজ, হাইকোর্টের জজ, মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা

জষ্টিস্ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

পর্য্যন্ত সকল পদেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এমন কি সম্রাটের প্রিভি-কাউন্সিলে ও ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভায় পর্য্যন্ত এদেশবাসী প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি।—মুদ্রাযন্ত্র ও পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদির সাহায্যে আমাদের দেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। ইংরাজের আমলে আমাদের দেশে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কি

কাব্য, কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান সকল বিষয়েই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া 'নোবেল পুরস্কার' পাইয়াছেন। ইহাতে সমগ্র সভ্য

সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জগতের সমক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে উদারনীতি।—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজার ধর্ম্মবিশ্বাসে কখনও হস্তক্ষেপ করেন না। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে আপন আপন ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে। বিচার বা রাজকার্যে নিয়োগ কালে কোন ধর্ম্মের উপর অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় না গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয়সমূহে কোন বিশেষ ধর্ম্ম-শিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য কাহাকেও জিজিয়ার ন্যায় কোন অতিরিক্ত কর দিতে হয় না।

সামাজিক উন্নতি।—অন্য ধর্ম্মে বিদ্বেষ না দেখাইলেও ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট আমাদের কুসংস্কারোৎপন্ন নিষ্ঠুর নীতিবিগর্হিত কার্য্যগুলি বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপ, দেবতার নিকট নরবলি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারগুলি তুলিয়া দিয়া আমাদের সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

সার জগদীশচন্দ্র বসু।

নিরপেক্ষ বিচার প্রণালী।—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত সুবিচার ছিল না, সকল জাতি বা সকল ধর্ম্ম বা সকল শ্রেণীর লোক এক ভাবে বিচারিত হইত না। জাতি ও ধর্ম্ম অনুসারে একই অপরাধের জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং প্রবল দুর্ব্বলের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতে পারিত। প্রবল ভূস্বামী দুর্ব্বল প্রজার যথাসর্ব্বস্ব

লইলেও তাহার শাসন হইত না। কিন্তু এখন ভারতবাসী ও ইংলণ্ড-বাসী, হিন্দু, মুসলমান, ও খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ধনী ও নির্ধন, রাজা ও প্রজা সকলেই একই দণ্ডবিধি দ্বারা শাসিত হইয়া থাকেন।
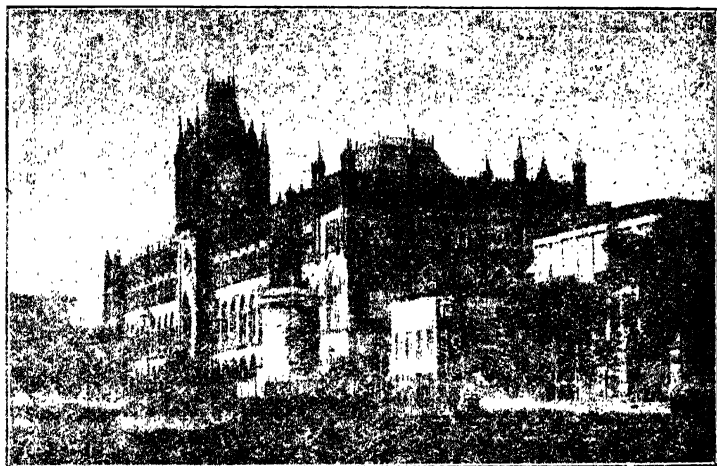
কলিকাতা হাইকোর্ট।

শান্তিরক্ষা।—ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে দেশে শান্তিরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে পুলিশের কর্ম্মচারীরা প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া টাকা কড়ি আদায় করিয়া লইত, যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক ছিল। কিন্তু এক্ষণে পুলিশের কার্য্যে অনেক সুশিক্ষিত লোক নিযুক্ত হইয়া প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিতেছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পুলিসের কর্ম্মচারীদিগকে রীতিমত মাসিক বেতন দিয়া থাকেন, এবং তাহাদের মধ্যে কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছে বা কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছে এরূপ প্রমাণ পাইলে তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকেন। এখন চুরী, ডাকাইতী, দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেক কমিয়া গিয়াছে।

স্বায়ত্ত শাসন।—ভারতবাসীকে উচ্চপদ দান করিয়াই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা প্রায় সকল কার্য্যেই এদেশবাসীর মত গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সুবিধা হইলেই স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ড্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সংস্কারের ফলে আমাদের ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-বর্গের মত অধিকতর প্রবল হইয়াছে এবং শাসন তন্ত্রের অনেক বিভাগ দেশীয় মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে অনেক বিষয়ে কার্য্যভার ইতঃপূর্ব্বেই আমাদের হাতে দিয়াছেন। লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্য্যনির্ব্বাহাদির ভার অনেকাংশে ভারতবাসীর হস্তে অর্পিত। এই গুলির দ্বারা ভারতবাসী কিরূপে নিজের দেশের শাসন নিজের হাতে করিতে হয় তাহা শিখিতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে 'পঞ্চায়েত' প্রথা ছিল, সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীরা মিলিয়া গ্রামের তত্ত্বাবধান করিতেন, গ্রামবাসিগণের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করিতেন, তাহাদের নানা অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সেই প্রথা পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের গ্রাম সমূহে স্বায়ত্ত-শাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কয়েকখানি গ্রাম একত্র করতঃ গ্রামবাসিগণের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া 'ইউনিয়ান বোর্ড' নামে একটী সমিতি গঠন করা হয়। সেই সমিতির হস্তে ঐ সকল গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নানাবিধ অপরাধের বিচার ও বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতির ভার অর্পিত হয়।

জাতীয় একতা।—ইংরাজ রাজত্বের আর একটী মহাহিতকর ফল, ভারতে জাতীয় একতাস্থাপন। পূর্ব্বে এক প্রদেশের লোকের সহিত অন্য প্রদেশের লোকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, তাহারা পরস্পরকে চিনিত না, জানিত না; সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে বিদেশীয়ের ন্যায় জ্ঞান করিত।

এখন আর সে ভাব নাই। সকলেই এখন এক রাজার প্রজা, এক রাজ্যের অধিবাসী, রাজ্যের সুখ দুঃখের সহিত সকলেরই সমান সম্বন্ধ। রেলপথাদির বিস্তার হওয়াতে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে পরস্পরের নিকটে মনোভাব প্রকাশেরও বাধা নাই, এবং সংবাদপত্রাদির সাহায্যে পরস্পরের সংবাদ সর্ব্বদা পাওয়া যায়। সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এখন পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে শিখিয়াছে। ইহার ফলে দেশে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে। ভারতের একাংশে কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্য প্রদেশের লোক সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয় এবং শাসন-সংস্কারের জন্য বা জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মিলিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করে। বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মরাঠা সকলেই এখন ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ একটী প্রকাণ্ড দেশ। এখানে অসংখ্য লোকের বাস; তাহাদের নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, নানা ভাষা, নানা ব্যবসায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের, অসংখ্য লোককে এক করিয়া, নির্ব্বিবাদে শাসন করা এবং সকলের মধ্যে সমভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিতরণ করা মনুষ্যের একরূপ সাধ্যাতীত। কিন্তু ইংরাজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই অসাধ্যসাধন করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহাদের জয় হউক!